জীবন আমার বোন

মাহমুদুল হক

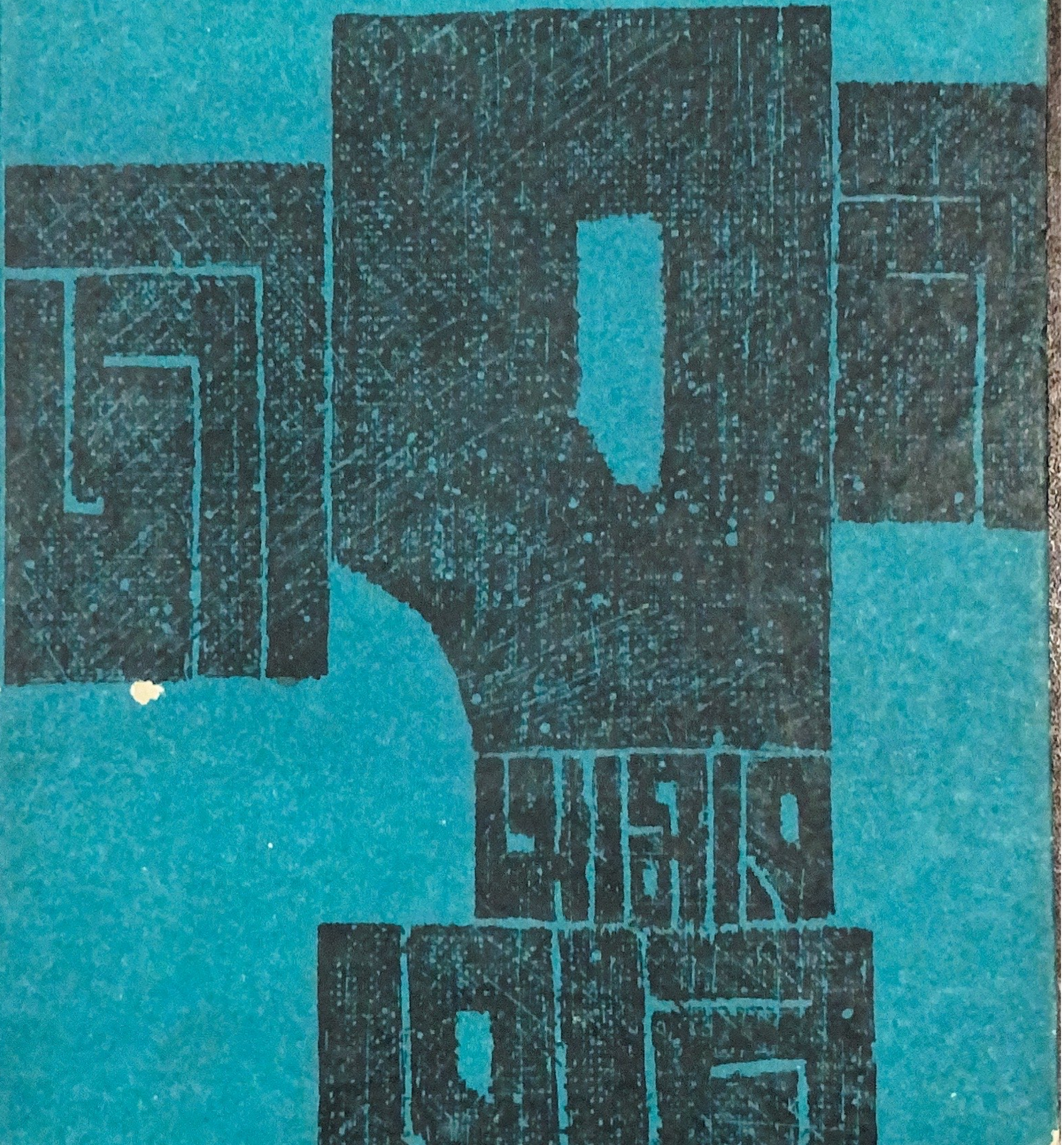

জীবন আমার বোন

মাহমুদুল হক

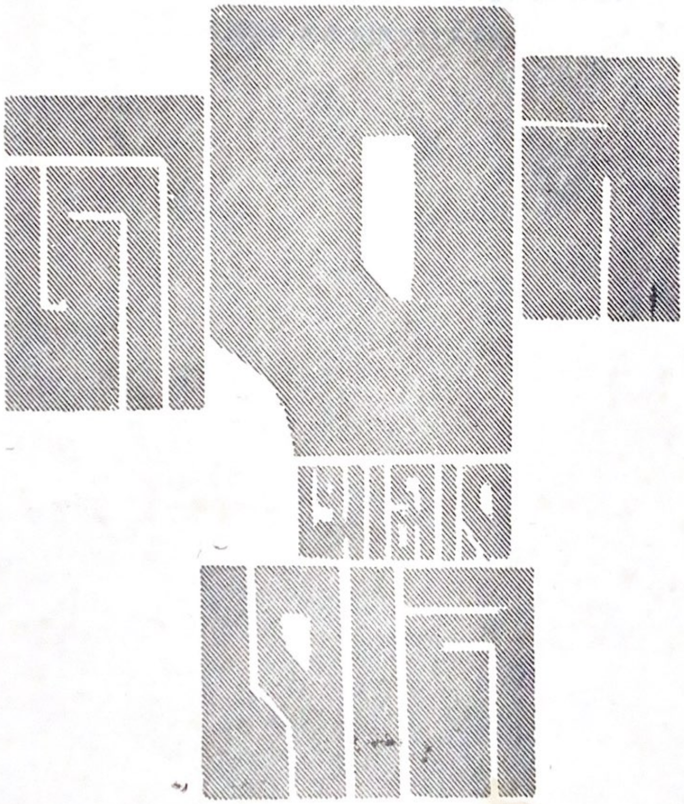

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব
প্রথম সংস্করণ : ২৫ বৈশাখ ১৩৮৩, ৭ মে ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ৯ ফাল্গুন ১৩৮৭, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
স্ব : হোসনে আরা মাহমুদ

মূল্য : কুড়ি টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা-২
মুদ্রাকর : মানিক লাল শর্মা, মনোরম মুদ্রায়ণ. ২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১

কাজলকে

'শেষ পর্যন্ত বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হ'লো তাহলে! আমি তো ভেবেছিলাম এ যাত্রায় বিছানা-বালিশ জব্দ করার পালাটা আরো বেশ কিছুদিন ধ'রে চলবে।'

বড় বড় চোখে রঞ্জুর দিকে তাকালো খোকা। বললে, 'কি বলতে চাস পষ্টাপষ্টি ব'লে ফ্যাল। এমনভাবে রোয়াব দেখাচ্ছিস যে এসবে তোর রাজ-রাজেশ্বরীর মাথাটা কাটা যায়।'

'আরেব্বাস! অমনি তা-ছোটা মুরগির মতো ঝটপটানি শুরু হ'য়ে গেল!'

'দ্যাখ রঞ্জু, বেশী ফাজলামি মারবিনা ব'লে দিচ্ছি! দিন দিন তোর পাকামির মাত্রাটা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে; বড়-ছোটর মান্য নেই। কি ঠাউরেছিস আমাকে?'

'তোর মাথায় নির্ঘাত ছিট হয়েছে। তোষক-বালিশে তা দিয়ে যে হারে হ্যালাখ্যাপার মতো ছারপোকার বংশবৃদ্ধি ক'রে চলেছিস তাতে কোনো ভদ্রলোক আর এ বাড়ি মাড়াবে না।'

'বুঝেছি। তাতে তোর বেজায় লোকসান।'

রঞ্জু হেসে বললে, 'রাখ, চান্স পেলে কানকো মারা বের করবো একদিন। চোত মাসের কই কোথাকার!'

মায়ের কথা মনে পড়লো খোকার ঝট ক'রে। খুব ছোটবেলায় তার লিকলিকে হাত-পা আর হাড় জিরজিরে শরীরের তুলনায় বেঢপ হেঁড়ে মাথার জন্যে যশুরে কই ব'লে ডাকতো মা, ওটা নাকি বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলার নাম। কিন্তু রঞ্জু—কোথা থেকে এসব পায় রঞ্জু।

বিছানার ময়লা চাদরের খুঁট ধ'রে জাল টেনে তোলার মতো ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে তুললো সেটা রঞ্জু। অভিধানসহ ইংরেজী-বাংলা

গোটা তিনেক বই, সিগ্রেটের প্যাকেট, দেশলাই, খোকার ব্যবহৃত গুচ্ছের আলতু-ফালতু জিনিশ জালের সুতো থেকে মাছ বাছাই করার মতো একটা একটা ক'রে টিপয়ের উপর রাখলো। চাদরটা মেঝেয় ছুড়ে দিয়ে বালিশের গায়ে ময়দা ঠাসার মতো ক'রে ঘুষি বসালো কয়েকটা। তার এপিঠ-ওপিঠ থাবড়া মেরে সেটাকে যথাস্থানে রেখে বিছানার তলা থেকে দলামোচড়া রুমাল, হিজিবিজি কাটা কাগজ, এটা-সেটা টেনে বের করতে করতে বললে, 'নাহ্, সত্যি তোকে এ বাড়িতে এক্কেবারেই মানায় না ; তুই বরং—'

'ই-য়াহ্ ! পোয়াবারো আরকি তোমার ! একটা কাঁট বেল্লিক !'

'অতো ঝাল লগড়াচ্ছিস কেন আমাকে নিয়ে ? তোর মতো এই এলুম ব'লে মাঝরাতে দেবদাস হ'য়ে ঘরে ফিরি না, আবার গাঁটে গাঁটে রসবাত না ধরা পর্যন্ত এক নাগাড়ে পাঁচ-সাতদিন বিছানায় সাঁতার-ও দিই না, চোর-চোট্টা-হাজতীর মতো আমার দাড়ি-গোঁফও নেই, দাঁতে মাখনের পলেস্তারাও জমে না তোর মতো ! ইশ্, গায়ের বোঁটকা গন্ধ নিয়ে, দাঁত না মেজে, দাড়ি না কামিয়ে, পানি না ছুঁয়ে থাকিস কি ক'রে ? তোর মতো পিপুফিশু আমি কোথাও দেখিনি।'

'কী-ইবা এমন দেখেছিস তুই; বয়েস তো আধপাতা ! বেশী গার্জেনি ফলাতে আসবি তো শালার ক'ষে এইসা রদ্দা লাগাবো যে ফিঁয়াসের নাম তক ভুলে যাবি।'

'কি বললি ?'

'ফিঁয়াসে ফিঁয়াসে ! কেন মুরগির মগজে ঢোকেনি বুঝি ? জানি মানে ভাতারের নাম নজ্জায় ধরি না, রাখ, তোর ন্যাকামি একদিন বার করবো !'

'তোর দাদাগিরির আমি কানাকড়ি দাম দিই কিনা। তোদের মতো আমি লোচ্চা-বেলেল্লা নাকি, যে স্রেফ ফিঁয়াসে জুটিয়ে বেড়াবো ?'

‘তা ঐ বহুবচনের মানেটা কি ?’

‘তুই আর তোর ইয়ার-বন্ধুরা !’

‘যোগ্যতা থাকলে তবে না জোটাবি। ফিঁয়াসে তো আর গাছের শুকনো পাতা নয় যে ডাল ধ’রে নিছক হুপাহুপ বাঁদরামি ক’রে নাড়া দিবি আর ঝুরঝুর ঝ’রে পড়বে। যোগ্যতার মধ্যে ওই একটাই, অযথা খুনসুড়ি পাকানো। কি কূট-কচালে ছুঁড়িরে বাবা ! যা, দাড়ি কামাবো, ঝট ক’রে পানি নিয়ে আয়।’

‘সবকিছু নিয়েই তো দিব্যি জাঁক ক’রে গেড়ে বসা হয়েছে, পানিটুকু নিয়ে বসলে গতরের এমন কিছু খেয়ানত হতো না।’

‘বহুৎ লেকচার ঝেড়েছিস, এবার কাজ কর। একটু নাই দিয়েছি কি না দিয়েছি অমনি মুখে খৈ ফুটতে শুরু করেছে। কাজ আছে, বাইরে বেরুতে হবে, নে নে, ঝটপট, জলদি ক্রো জলদি ক্রো—’

গায়ে টিকে তোলা কাঁচের বাটিতে খানিকটা পানি নিয়ে এলো রঞ্জু ; খোকা তখন পানপাতার মতো একটা আয়না চকচকে স্ট্যাণ্ডের উপর এঁটে গালে হাত বুলিয়ে মাত্র ক’দিনের অযত্নে লালিত ভয়ানক রকমের রুক্ষ আর তীক্ষ্ণ আদল টিপে টিপে নিরিখ করছিলো।

‘ঠিক যেন একটা গাঁজাখোর ! যা চোয়াড়ে মার্কা চেহারা হচ্ছে না তোর দিন দিন ! ভালো ক’রে ঠাহর করতে পারছিস কাঁচের হার্টে, না লাইট জ্বেলে দেব ?’

‘ঠাহর কি বে ? ঠাহর কি ? কথার কি ছিরি, কড়ে আঙুলের মতো পুঁচকে ছুঁড়ি, তার আবার কথার বহর কত ! ঠাহর, চোয়াড়ে, গতর, ঝাল লগড়ানি, কানকো মারা, পানিওয়ালী মাতারি কোথাকার ?’

দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডার নামিয়ে ঝেড়ে-পুঁছে একটা পাতা উল্টিয়ে সেটাকে আবার যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখলো রঞ্জু। এই মুহূর্তে তাকে নিদারুণ চিন্তাক্লিষ্ট আর গম্ভীর দেখায়। দাড়ি চাঁচতে চাঁচতে আড়চোখে একবার দেখলো খোকা। আজকাল প্রায়ই তার

মনে হয় রঞ্জু ইতিমধ্যেই বয়েসের তুলনায় মাত্রা ছাড়া গাম্ভীর্য কুক্ষিগত ক'রে ফেলেছে। সাংসারিকতাকে ঠিক দায়ী করা যায়না এজন্যে, হিশেব ক'রে দেখেছে খোকা, টোল নেই রঞ্জুর গাম্ভীর্যে, কোনো ছিদ্র নেই, মনে হয় সন্ন্যাসিনী ; দু'টি আয়ত চোখ মেলে রহস্যময় অচেনা ঘুলঘুলিতে সব সময় কিছু একটা খুঁজে বেড়ায় সে।

'জানিস দাদা, ক'দিন থেকে আমার শুধু মনে হচ্ছে অন্যান্যবার যা হয় এবার তা হবে না, বাপি সময়মতো এসে পৌঁছুতে পারবে না, তুই দেখিস—'এ কথায় তার গলায় বিষাদ ঝ'রে পড়ে।

নাকের ডগা থেকে ক্রীমের ফেনা মুছতে মুছতে খোকা জানতে চাইলো, 'এ রকম মনে হওয়ার কারণটা জানতে পারি কি ?'

ক্যালেণ্ডারের একটা তারিখের উপর হাত বুলিয়ে ভাসা ভাসা গলায় রঞ্জু অনেক দূর থেকে বললে, 'অন্যবার বাপি আসার তারিখটা প্রায় মনেই থাকেনি, দেখতে না দেখতে দিন কেটে গিয়েছে, টেরই পাওয়া যায়নি, দেখা গেল হুট ক'রে একদিন বাপি এসে হাজির। এবারে কোনো রকমেই আর তারিখটা আসতে চায় না ; তারিখটা যেন পথ হারিয়ে ফেলে একটা উটের মতো মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে—'

'মেইরেছে, এ শালার আর এক জেন ডিকসন !'

'গতরাতে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি---' কাছে স'রে এসে খুব অন্তরঙ্গ হ'য়ে রঞ্জু বললে, 'হাতিয়া-সন্দ্বীপের সাইক্লোনের সেই ফোলা ফোলা পচাখসা লাশগুলো খবরের কাগজ থেকে বের হ'য়ে অলি-গলি রাস্তা-ঘাট এখানে ওখানে লুকোচুরি খেলছে আর কুরকুট্টি দিয়ে হাসছে !'

বাঁ হাত দিয়ে রঞ্জুর বিনুনি ধ'রে মুঠো পাকালো খোকা। বললে, 'এইসা থাপ্পড় মারবো যে গুলতাপ্পি ভুলে যাবি ! আব্বে ছুঁড়ি, ওটা বোক্কাচিও সেভেনটির অনিতা, বেমালুম কপিরাইট ঝাড়ন্তিফাই করা হচ্ছে, এ্যঁ !'

'ঠাট্টা নয়, বিশ্বাস কর দাদা, ভোররাতে মাকেও দেখলাম। অনেক দিন হ'লো তুই ঘরে ফিরিসনি, আমি একা থাকি আর ভয় পাই ব'লে মা আমার কাছে শুতে আসে, এইসব। তোর জন্যে মা খুব কাঁদলো। কবে নাকি তুই বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে জুয়া খেলেছিস, হাতের আংটি বেচে দিয়েছিস, আরো অনেক অভিযোগ, পরিষ্কার মনেও নেই সব—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খোকা বললে, 'তাই বল! তোর স্বপ্নের-ও দেখি মারাত্মক রকমের একটা মোর‍্যাল থাকে, তা ভালো—'

'দুৎ! সব কিছুতেই তোর ঠাট্টা!'

খোকা একটা চিমটি দিয়ে বললে, 'মা তোর কাছে কান্নাকাটি তো করবেই, তুই তো আমার লোকাল গার্জেন—'

'গার্জেনই তো—'

'তবু ভালো, আজকাল আর আগেকার মতো কায়দা ক'রে গাজিয়েন বলিস না।'

কিছু একটা ভেবে রঞ্জু বললে, 'বাড়িতে একটা মিলাদ-টিলাদের ব্যবস্থা কর না; আমার কেমন যেন লাগছে ক'দিন থেকে।'

'চল, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই তোকে।'

রঞ্জু কোনো উত্তর দিলো না। খুব খুশি হয়নি সে, বরং ধ'রে নিয়েছে এটা খোকার নিছক কুড়েমিসুলভ এক নিষ্ঠুরতা, পাছে আলসেমির ভাঁজ ভাঙে এই ভয়ে সে বহু কিছুই করতে নারাজ। রঞ্জু যে সন্তুষ্ট নয় এই মুহূর্তে অতি সহজেই তা খোকার কাছে ধরা পড়ে; বুঝতে অসুবিধা হয় না ভিতরে ভিতরে ও কিভাবে গুমরে উঠছে।

বুঝলেও, বিশেষ কতোগুলো ক্ষেত্রে বেশি আমল দেওয়াটা খোকার স্বভাব বিরুদ্ধ; রঞ্জুটা এখনো বড় ছেলেমানুষ—বরং এইভাবে ভাবতে তার ভাললাগে, সে অভ্যস্ত-ও এই জাতীয় ধ'রে

নেওয়া চিন্তা-ভাবনায়। বিশেষ ক'রে রঞ্জু যখন বয়েসে ছোট, জাতে মেয়ে, সবচেয়ে বড় কথা মাথার উপরে তেমন কেউ নেই, এক্ষেত্রে উটকো আকাঙ্ক্ষা তার কাছে সুলভ অথবা সহজসাধ্য হোক খোকা তা চায় না। খোকা মনে করে এটা একটা সংকট, ফলে তার পদক্ষেপ অযথা হিশেবের ফেরে পড়ে এবং তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটা এক ধরনের সংস্কার, খোকা জানে। কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সে সজ্ঞানেই এই সংস্কারকে মেনে নিয়েছে। এই সংস্কার তার দায়-দায়িত্বকে অল্প-বিস্তর আচ্ছন্ন ক'রে রাখলেও, খোকা একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে ভালবাসে।

খুব ছোটবেলায় একবার, বেশ মনে পড়ে খোকার—তখন মহামারী চলছে গোটা দেশ জুড়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে দু'পয়সার চালতার আচার কিনে খেয়েছিলো সে ছেঁড়া ধুড়ধুড়ি ন্যাতাকাপড় জড়ানো এক নড়বড়ে বুড়োর কাছ থেকে; অথচ বারণ ছিলো, বারণ এবং কড়া পাহারা। তা সত্ত্বেও দু'পয়সার আচার সেই বয়েসে এমন ঈপ্সিত এমন বাঞ্ছিত হ'য়ে উঠেছিলো যে নিষেধের বেড়া ডিঙতে তিলবিন্দু দ্বিধান্বিত হয়নি সে। ফলে যা অনিবার্য তা-ই ঘটেছিলো, কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলো সে। মা তখনো বেঁচে; যমে-মানুষে টানাটানি যাকে বলে, সমানে তা-ই চললো। রঞ্জুর ব্যাপারটা ঠিক এই ধরনের না হ'লেও খোকা তার বিচারের মাপকাঠি এই ভাবেই তৈরি করেছে।

খুব ক্লান্ত দেখায় রঞ্জুকে। এত মলিন কেন রঞ্জুর মুখ? মা মারা গিয়েছে আজ প্রায় ছ'বছর হতে চললো; এই ছ'বছরে রঞ্জুই তার সবচেয়ে ধারে-কাছের মানুষ, উঠতে বসতে দু'বেলা একভাবে সে তাকে দেখে আসছে, অথচ অনেক কিছুই সে জানে না, বুঝতে পারে না, কখনো কখনো এমন দুর্বোধ্য এমন অচেনা মনে হয় রঞ্জুকে যার ফলে সে খেই হারিয়ে ফেলে। কে জানে, হয়তো এই দীর্ঘ ছ'বছরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একটি ছায়া প্রসারিত হয়েছে রঞ্জুর

মনের গহনে, যে ছায়া মানুষের একটি খণ্ডিত অতীতকে চিরকালের জন্যে অবিচলভাবে ধ'রে রাখে, নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র ভবিষ্যতকে। অনেক কিছুই মনে হয় খোকার ; বিশেষ একটি অভাব বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জুর মুখের ছবিটিকে বিষাদের আচ্ছন্নতায় হিম-শীতল ক'রে তুলছে, বেঁচে থাকা উচিত ছিলো মা'র।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে খোকা বললে, 'বাইরে বেরুনোর মতো জামা-কাপড় আছে তো?'

'বোধহয় আছে, দেখছি—'

বোঝা গেল রঞ্জু চালাকিটার বিন্দু-বিসর্গও ধরতে পারেনি।

সত্যি, রঞ্জুটা একটা ল্যাঠা ; এই আলো, এই আঁধার, থেকে থেকে একটা কিছু ঘটে ওর ভিতর। স্বভাবটাও তৈরি করেছে বিদকুটে। স্কুলের পাট চুকিয়ে এ বছর থেকেই কলেজে যাচ্ছে, ব্যাস্, ওই পর্যন্তই সমবয়েসী কারো সঙ্গে মেলামেশা, ছিটেফোটা শপিং-এ বেরুনো, কোন ফাংশন অথবা সিনেমায় যাওয়া, কখনো কোনো কিছুতেই ও নেই। সময় মতো কলেজে যাওয়া, লেবু আর ময়নাকে দিয়ে সংসারের কাজ গুছিয়ে নেওয়া, মাঝে মাঝে দু'একটা গল্প-উপন্যাসের পাতা ওল্টানো, নিজের পড়া করা, এইসব নিয়েই সময় পার হয়ে যায় রঞ্জুর। বাগানের ব্যাপারে তুমুল উৎসাহ ছিলো তার এক সময়। বাগান পরিচর্যার জন্যে রমনা পার্কের এক মালির সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে তারা। হাতেম আলি অর্থাৎ ঐ গুণধর মালিরত্নটি নিয়মিত তার মাসোহারাটি গুনে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাগানে আগাছা-কুগাছা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছুর তদারকি করেছে রঞ্জু, দু'ঘণ্টার মাঝে দম ফেলার ফুরসৎ মিলতো না ছোকরা হাতেম আলির। কিন্তু এখন! সেখান থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে রঞ্জু। আগে হপ্তায় কদিন সে কামাই করছে রঞ্জুর তা হিশেব থাকতো, এখন গা ছেড়ে দিয়েছে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই

কিছু না। কিছু পরিবর্তন ঘটে, রঞ্জুর সেই পরিবর্তন কোন খাতে বয়ে চলেছে সে জানে না, গা ছমছম করে খোকার, তার অন্তরাত্মা কেঁপে যায়। তার নিজের এখন বাইশ বছর চলছে ; 'টু লিটল ডাকস্— টুয়েন্টি টু' তার মনে হয় না, তার মনে হয় এক জোড়া উদ্ধত রাগী গোখরো ফণা তুলে রেখেছে তার দিকে, সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।

বয়েস কতো হলো রঞ্জুর? গালে রেজর টানতে টানতে হিশেব করলে খোকা, সাত বছরের ছোট রঞ্জু। আরো দুটি বোন ছিলো রঞ্জু আর তার মাঝখানে, একজন অঞ্জু আরেকজন মঞ্জু। বাঞ্ছারামপুরে মামাবাড়ির পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটের শ্যাওলায় পা হড়কে পানিতে প'ড়ে যায় অঞ্জু, মঞ্জু নামে তাকে ধরতে ; বাঁচানো যায়নি দু'জনের একজনকেও। রঞ্জু যেন মামাবাড়ির সেই আশ্চর্য শান্ত তিরতিরে পুকুর যার গভীর গোপন তলদেশে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছে অঞ্জু আর মঞ্জু।

দাড়ি কামানো শেষ ক'রে গোসলখানায় গেল খোকা ; একটানা চারদিন বিরতির পর শরীর জুড়নো দীর্ঘ গোশল চাই।

+

ধানমণ্ডির একটা বড় রাস্তার কোল ঘেঁষে খোকাদের বাড়ি। মহম্মদপুরগামী বাসে ঈদগা অথবা মধুবাজার স্টপেজে নামলেই কয়েক পা হেঁটে তাদের বাড়িতে পৌঁছনো যায়।

বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দূর থেকে নিজেদের বাড়ির গাড়িবারান্দার ছাদে হুমড়ি খেয়ে পড়া বোগোনভিলিয়ার খুন-খারাবি দেখতে পায় খোকা। ইউলিসিসের সমুদ্রগামী জাহাজ, মাস্তুলের মতো খাড়া ইউক্যালিপটাস গাছটা দেখে তাই মনে হয় এখন। কাতানের ফুরফুরে পাঞ্জাবি আর ধবধবে পায়জামায় ফিটফাট বাবুটি সেজে

বেবিট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সবকিছু কেমন নির্ভার মনে হ'লো খোকার।

আজ চারদিন পর ঘর থেকে বের হয়েছে সে। হয়তো বহু কিছুই ঘ'টে গিয়েছে সারা দেশে। রাজনৈতিক সংকট তো আছেই, তার উপর চতুর্দিকে হাজার রকমের ডামাডোল। জাহাজ বোঝাই সৈন্য চট্টগ্রামের দিকে ছুটে আসছে. বেলুচিস্তানে ঈদের জামাতের উপর বোমা দাগানো কসাই টিক্কা খান আসছে নতুন লাট-বাহাদুর হ'য়ে ; দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার, ছবি, তবু এসবের কোনো গুরুত্ব খোকার কাছে নেই। রাজনীতির ব্যাপারটাই আগাপাস্তলা একটা জমকালো ছেনালী ; একজন শিক্ষিত নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে তার পুরোপুরি ধারণা থাকলেও ভোটার লিস্টে সে তার নাম তালেনি। রাজনীতির ব্যাপারটা তার কাছে শিকার ফসকাতে না দেওয়া হুবহু সেই মাদামোয়াজেল ব্লাঁশের মতো।

কিন্তু যাওয়া যায় এখন কোন দিকে ? কাজের অছিলায় তো বের হওয়া গেল, খোকা লক্ষ্য স্থির করতে করতে ভাবলো—আপদ আর কি, ভরা দুপুর এখন, রেক্সে গেলে একটা আড্ডা চলতে পারে, আড্ডা চলতে পারে গোপীবাগে ইয়াসিনের ওখানে। ইছাপুরায় তার কলেজ বন্ধ থাকায় দেদার মিটিং শুনে বেড়াচ্ছে ছোকরা ; কথা বলার মানুষ পেলে ভর দুপুরে একটা হিল্লে হবে ওর। আর যাওয়া যায় রাজীব ভাইয়ের ওখানে, অবশ্য রাজীব ভাইকে এই সময় পাওয়া দুষ্কর ; কুমীরের চামড়ার একটি ব্যাগ বগলদাবা ক'রে রাজীব ভাই নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে গিয়েছে। আর কেউ না থাকুক নীলাভাবী আছে ; শোরগোলের পর আর ওদিকে যাওয়াই হয়নি খোকার।

মুরাদের ওখানে গেলে কি হয়! মুরাদকে সঙ্গে নিয়ে তারপর ইয়াসিনের ওখানে ঢুঁ মারা চলে।

খোকা স্পষ্ট বুঝতে পারে এই মুহূর্তে নীলাভাবীর দখলে চ'লে

গিয়েছে সে, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তার। সত্যি, আশ্চর্যের কথা, নীলাভাবীর জন্যে আজকাল অকারণে তার মন আকুল হয় না; যেন অভাবনীয় একটি বই, প্রথম কয়েকটি পাতা পড়ার পরই দুর্মদ কৌতুহল সামলাতে না পেরে অধৈর্য পাঠকের মতো সে শেষটা প'ড়ে ফেলেছে।

অনেকদিন পর নতুন ক'রে খোকার আবার মনে হ'লো কারো জন্যে মন খারাপ করার এই বিশ্রী ব্যাপারটা না থাকলে দুনিয়াটা সত্যিই একেবারে ফিকে পানসে হ'য়ে যেত, এই এখন যেমন রঞ্জুর জন্যে তার ভারি খারাপ লাগছে। সে যখন বের হয় তখন মুখ আঁধার ছিলো রঞ্জুর।

না, রেক্সে যাওয়া চলবে না। ইদানিং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন, ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র, আইনগত কাঠামো, চীনের চাবি ভুট্টোর খেল-তামাশা, এইসব নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় উঠছে ওখানে। আর আহামরি এক লেখক পেয়েছে গোরভিদাল, তাই নিয়েও কতো মত বিনিময়ের ছড়াছড়ি; এক একটা নিরেট মাল সব। বরং নীলাভাবী অনেক ভালো। কথার প্যাঁচে ফেলে একে অপরকে অহেতুক হেনস্থা করার কোন অপপ্রয়াসই নেই ওখানে। আড্ডা আর তর্কের মুখোশ এঁটে বন্ধুরা যখন মাঝে মাঝে হীন মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে একে অপরের নামে কাদা ছোড়াছুড়ি করে, জারিজুরি ফাঁসের ব্যাপারে পরস্পর নোংরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়, তখন তার মন বিশ্রীরকম তেতো হয়ে যায়। নীলাভাবীর ওখানে আর যা-ই হোক এইসব কদর্য ব্যাপারের মুখোমুখি হ'তে হয় না তাকে; কখনো কুঁজো বামন অস্কারের মতো টিন ড্রাম বাজায় না কেউ, বরং 'ঘুমের ভিতর বালকের পেচ্ছাবের মতো' অলক্ষ্যে সময় কেটে যায়।

শোরগোল,—হ্যাঁ একটা শোরগোল ক্রমশ জোরালো হ'য়ে অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে বাতাসে। খোকা কান পাতলো, দ্রুত ফুঁসে

উঠছে হৈহল্লা, একটা মিছিল রায়ের বাজারের দিক থেকে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো এঁকেবেঁকে সদর রাস্তায় উঠে ই. পি. আর-এর দিকে এগিয়ে চলেছে ; কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে ঢাকা শহর, কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষ, কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে লোহার রড, কালো পতাকা, বর্শা, তরোয়াল, বৈঠা, কোদাল, শাবল, কাঁধে নিয়েছে যে যা পেরেছে। কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে যাবতীয় দৃশ্যপট, বদলে যাচ্ছে মুখের আদল, দ্রুত দ্রুত, দ্রুত এবং ধাবমান, গ্লেসিয়ারের মতো ধাবমান ; দুর্মদ মৃত্যুর মতো দরগলমান গ্লেসিয়ার। মানুষ ! মানুষ ! মানুষ আর মানুষ ! 'আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়, কারা বিদ্রোহের পথ মাড়ায়'—গা ছমছম করতে থাকে খোকার। কবিতার একটি পুরোনো পংক্তি, অথচ আজ কেন যেন সর্বাঙ্গ শির শির ক'রে উঠলো, একটা অভূতপূর্ব অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চের ঝাপটা লাগলো তার সর্বাঙ্গে। বাঁধভাঙা বন্যার তুমুল জলস্রোতের মতো অবিরাম অবিশ্রান্ত মানুষ ; শস্যক্ষেত খামার উঁইটিবি বাঁশঝাড় সাঁকো শহর-বন্দর-গণিকালয় সবকিছু সেই অপ্রতিরোধ্য জলরাশির বিমর্দিত তোড়ের মুখে অকাতরে ভেসে চলেছে। এ কোন নূহের প্লাবন, ভিতরে ভিতরে খোকা টাল খায়, তার মাথা দপ দপ করে।

বেরুবার আগে মুখ কালো ক'রে ফেলেছিল রঞ্জু। বলেছিল, 'না বেরুলে চলে না ?'

'তোর অসুবিধেটা কি ?'

'আমার ভয় করে। পাড়াটা কেমন থমথমে হ'য়ে আছে—'

একবার মনে হ'লো খোকার, থাক, কোথাও গিয়ে কাজ নেই ; কিন্তু ঘরে ফেরাও এই মুহূর্তে তার পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত ব্যাপারটা খোকার কাছে নিছক খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার মতো কিছু একটা মনে হয়, মিছিলের মানুষগুলোর মুখে দুরারোগ্য অসুস্থতার অক্ষর পড়তে থাকে সে। কোনো স্তরের মানুষের সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কেমন একটু ভিন্নধাতে গড়া আমি—খোকা মনে মনে

নিজেকে সামাল দিতে থাকে, কি ঘটছে না ঘটছে আমি তার কোনো তোয়াক্কাই করি না, অথচ ফুটপাতের পানওয়ালা থেকে মাটিকাটা কামলারাও কম-বেশি কিছু না কিছু বলতে সক্ষম ; সময় বদলে দেয় মানুষকে, অথবা মানুষই কান মুচড়ে চাঙ্গা ক'রে তোলে প্রাণশক্তি বিবর্জিত নির্জীব সময়কে, এবং আমি কোনো কিছুর ভিতর নেই। দেশ, দেশের কল্যাণ, দেশের ভবিষ্যত, দেশপ্রেম, এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই তার মগজে ঢোকে না। এইসব ভজকট ব্যাপারে নিরর্থক অপচায়িত না হ'য়ে বরং শিথিল আলসেমির ভিতর ডুবে থাকা ঢের ভাল, অন্তত নিরাপদ তো বটেই। রিকশার হাওয়া ছেড়ে দেওয়া, বাসে আগুন ধরানো, পুলিশের গায়ে ইট মারা, দেশের প্রতি নিজের প্রগাঢ় অনুরাগকে তুলে ধরার এতো অসংখ্য তীব্র ও আকর্ষণীয় পথ চারপাশে ছড়ানো থাকলেও কখনোই সে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না, আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা তার হাত-পা। পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের সময় চোর-ছ্যাঁচড় গাঁটকাটারাও ফৌত হ'য়ে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলো, দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলো ব্যাটারা ; কেউ কারো পকেট কাটেনি, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি বিলকুল বন্ধ ছিলো, সময় গিয়েছে একটা। রাজনৈতিক সংকট কি নতুন কোনো ব্যাপার, শয়তানি আর বজ্জাতি কবে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে মানুষ। মানুষ, অর্থাৎ শয়তানের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, সে কখনো তোমাকে বাছা ব'লে হাতে তুলে খাঁটি ছানার রসগোল্লা খাওয়াবে না ; যদি গেলাতে চায়, তার আগেই সাবধান হ'তে হবে।

খোকার ভিতরে একটা বিশাল মাঠ ধু ধু ক'রে জেগে উঠলো, সেখানে লোলচর্ম নীতিবাগীশদের চিড় খাওয়া কবর ; কিংবা ঠিক তা-ও নয়, সে স্বস্তি পায় বিরোধিতায়, এটা তার এমনই একটি আত্মনিমগ্ন স্বভাব যার মর্মোদ্ধার কোনোদিনই সে করবে না। খোকা জানে আর পাঁচজনের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া তার

পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। ট্যানারি শ্রমিকরা রাজনীতির বোঝেটা কি, গিনিপিগ এক একটা। হাতের কবজিতে যারা সর্দি মোছে, এখনো যাদের পা গড়িয়ে পেচ্ছাব পড়ে, সেইসব হাফপ্যাণ্ট পরা ইস্কুলের গালটেপা ছেলেরাও চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দীক্ষা দিচ্ছে। কোথায় আমেরিকা কোথায় চীন আর কোথায় ফৈজুদ্দিন ব্যাপারি প্রাইমারী স্কুলের লালটুমার্কা ছেলে ; কোন অন্ধকারে ব'সে কে বিধাতার মতো কলকাঠি নাড়ছে ওরা তার সবকিছু বোঝে। ধর্ম আর রাজনীতি ব্যবসার রাঘব-বোয়ালরা ভেজাল ওষুধের কারবারী কিংবা পচা মাছ বিক্রেতার চেয়েও জাতে নিকৃষ্ট—এই জ্ঞান যখন টনটনে হয় ততদিনে সংগ্রামী ছাত্রজীবনের আয়ুও শেষ, অতএব কোমরে গামছা বেঁধে সি. এস. এস. অথবা ঐ জাতীয় একটা কিছুতে ঝপাং ক'রে লাফ না দিলে পাপস্খলনের সুযোগ তাদের জন্যে বারবার ফিরে আসে না। অন্ধের পায়ের পাতার চেয়েও সন্ধানী আর সতর্ক প্রগতিশীল অথবা বামপন্থী গণ্যমান্যদের অনেকেই এখন ইণ্টারকনের লোলুপ নিভৃতে ব'সে কাটিশার্ক-ব্যালেণ্টাইনের মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গে দূর থেকে নমস্কার করে স্কটল্যাণ্ডকে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পুঁজি, মুনাফা, শ্রেণী সংগ্রাম, রিয়েলিটি, গণতন্ত্রের গ্যাঁড়াকল, নিও-হ-য, আলট্রা ব-র-ল, এসব-ও যথারীতি মোচড় মেরে স্থান পায়, এবং পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো অতি সহজে সিল্‌ক খুলে ফেলে মেয়েদের—রাত যখন গভীর হয় কিংবা দিন যখন রাত্রিকালের গভীরতম প্রদেশ ব'লে ভ্রম হয় ; অর্থাৎ বামাপন্থী হওয়াই সব কথার শেষ কথা। আইজেনস্টাইনের ছবির প্রসঙ্গ তুলে মুগুর ভাঁজাভাঁজি, পাবলো নেরুদার কবিতার চচ্চড়ি খাবলানো, পিকাসোর দেয়ালচিত্র নিয়ে গাবাগাবি, এখন আর তেমন দানা বাধে না ; কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে, মাটি মাটি, ফ্যাঙ্গাস ধরেছে এইসবে, বরং ভেনেসা রেদগ্রেভের নির্ভার স্বপ্ন মঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে, অধিকার করে সবকিছু। সংগঠনের বস্তাপচা কামড়া-কামড়ি

খামচা-খামচির খবরের মাঝখানে জাব্দা দেয়ালের ফুটো দিয়ে আসা এলসা মার্টিনেলির পায়ের গড়ন আলো বাতাস বৃষ্টির ঝাপটার কাজ করে, সোফিয়া লোরেনের বুকের মাপ বিদ্যুতের অলৌকিক চাবুক হয়ে লেজ নাড়তে শেখায় রিং মাস্টারের নাকের ডগায় ; বালকের বিধ্বংসী হাতে রবারের লাল বেলুনের মতো অমন বুক হাতে এলে বিপ্লবকে তিনকুড়ি বছর বস্তাবন্দি ক'রে গুদামে পুরে রাখা যায়।

টনটনে রৌদ্রে হাবার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে এসব কি ভাবছি—খোকা মনে মনে কতকটা কাদা মেখে উঠে এলো। একটা নির্বোধ উত্তেজনা স্নায়ুতন্ত্রীকে আচ্ছামতো কাবু ক'রে ফেলেছে। কিসের প্রত্যাশায় খুঁটিগাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি এখানে, নূহের নৌকো আসন্ন কোনো দিগন্তপ্রবাহী সর্বনাশা জলস্রোত থেকে শস্যবীজের মতো তুলে নেবে ব'লে, কেন দাঁড়িয়ে আছি, খোকা নিজের উপর বিরক্ত হয়। সবকিছু সহজভাবে নিতে না পারাটা একটা বিদকুটে মানসিক দুরবস্থা, জটিলতাজর্জর অস্বাচ্ছন্দ্য ; এইসব নচ্ছার এলোমেলোমির কোনো হাত-পা নেই—হিজিবিজিকাটা একটা দলামোচড়া কাগজ মনের ভিতরের পকেটে ফশ ক'রে হাত চালিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়।

বেবিট্যাক্সি থেমেছিলো হাত তোলা দেখে, তাতে চ'ড়ে বসলো সে। আপাতত সুনির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, পালে যখন হাওয়া লেগেছে কোথাও না কোথাও গিয়ে ঠিকই ভিড়বে।

রমনা গ্রীন আর রেসকোর্সের মাঝের রাস্তার সেগুনবীথিতে মড়ক লেগেছে, পাতাগুলো ঝল্‌সে যাচ্ছে, ন্যাতাকুড়ুনি পাতাকুড়ুনি ফ্যালনা মেয়েরা জাফরি কাটা ছায়ায় কেউ আসনপিঁড়ি হয়ে কেউ ঠ্যাং ছড়িয়ে ব'সে চুলে বিলি কেটে উঁকুন খোঁটাখুটিতে মশগুল। মাঠটাকে খোকার মনে হয় দুপুরবেলায় ঝল্‌সে ওঠা সবুজ পানায় ভরা একটা মস্তদীঘি। কালীবাড়ি যেন শিয়ালমুখো আনুবিস ; দীঘির দাম ফুঁড়ে মুখ তুলে রেখেছে, পারলৌকিক যাত্রায় গোটা

শহরের আত্মাকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিট্যুট পার হ'য়ে ডানে বাঁক নেওয়ার পর খোকার মনে হয় সারিবদ্ধ অশ্বত্থের বিপন্ন ডালগুলো ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে হাহাকার করছে। পিচ গলছে। সারা রাস্তার গায়ে ঝরাপাতা আঠার মত লেপ্টে আছে, যেন অতিকায় চিতাবাঘের গায়ে ডাঁ ডাঁ ক'রে উঠছে এক প্রবল পরাক্রান্ত ক্রোধান্ধ দুপুর।

গণ্ডারের মতো দুপুর, ছ্যাকড়ামার্কা ঝরঝরে বেবিট্যাক্সির ঝাঁকুনি, চরম মানসিক বিশৃঙ্খলা, সবকিছু একজোট হ'য়ে ভিতরে ভিতরে রহস্যময় দিগদর্শনের কাজ করে, 'বেবি, সেগুনবাগিচা—' ফশ ক'রে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় খোকার।

আবার সেই সেগুনবাগিচা। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে যাচ্ছি ক্রমাগত, আমি খোকা, কতো কুকাণ্ডের যে পাণ্ডা, একজন পাজীর পা ঝাড়া; স্রেফ বাইরেই মনোরম প্লাস্টিক পেণ্ট, ভিতরের সব দেয়াল নোনাধরা, চটা ওঠা, খাস্তা, উত্তাল তরঙ্গময় সামুদ্রিক বিছানায় উপুর হ'য়ে পড়েছিলাম, ফেনিল একটি শরীর মুহুর্মুহু তোলপাড় করছিলো বিছানায়,—এইভাবে খোকার যাবতীয় স্মৃতি মাংসাশী হ'য়ে যায়, সেখানে আতশবাজির ধুম শুরু হয়,—উত্তেজনা যত তীব্র তত মধুর, যত মধুর তত অপবিত্র, অপবিত্রতা ইহলোকে যৌবনদান করে আমাদের, জাহাজের মতো বন্দর থেকে বন্দরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই যৌবন।

এইসব মনে হয় খোকার। খোকা এ-ও জানে, টাইটানিক যে জাহাজ, একদিন ভরাডুবি হয় তারও।

ভিজে কুকুরের মতো গা থেকে কাদা ঝাড়তে থাকে এক ধরনের অনুভূতি; অপরাধবোধ সম্পর্কে তার ধারণা খুব একটা স্বচ্ছ নয়, কেবল এই অনুভূতির আলগা স্পর্শে অল্প-বিস্তর সংকুচিত হ'য়ে পড়ে সে। আমাদের ভিতরে যে কতো প্রবল মানুষের আস্তানা পাতা,

যারা প্রায় সকলেই অচেনা, কখন যে কার করায়ত্ত আমরা, ইহকালে তা জানা যাবে না কখনো আগেও ভেবেছে খোকা এসব। যে স্তন দৃপ্ত খেলোয়াড়ের হাতের বল হ'তে চায়, দন্তক্ষতের মালা জড়াতে চায়, নির্বোধ শিশুর ঠোঁটে তা অমন উগ্র অথচ মধুর হয় কিভাবে, খোকার মাথায় তা খেলে না; তার শুধু মনে হয়, একা নই, কেউ-ই আমরা একা নই।

দুপুরে সামান্য একটু গা ঢেলে দিয়ে বিছানায় নিছক আরাম ক'রে বসার সূত্র থেকে কত বড় অঘটনই না ঘটতে পারে। ঝপ ক'রে, যেন কারো হাত ফস্কে প'ড়ে গিয়েছিলো এক সুগোল স্বপ্নের ইদারায়, যেখানে নিজের কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা-হিম পলেস্তারার গায়ে পাক খেয়ে শঙ্খিল গতিতে ব্যর্থই প্রতিধ্বনিত হয়। হাঁসফাঁস করতে থাকে খোকা। বহুদিন আগে গাছ থেকে খ'সে পড়া একটা ঝুনো নারকোল সে, গরু-ছাগল মুতে ভাসানো মাটিতে প'ড়ে আছে, একটা ফোঁপল সন্তর্পণে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিপুণতায় চাপ দিচ্ছে ভিতরে। খোকা যেন একটা নিরেট জগদ্দল গুণ্ডার নাম। বডি বিল্ডার খোকা, ন্যুইয়ার্স ডে-তে বলরুমের শ্যাণ্ডেলিয়ার ওয়ালথার পিপিকের গুলিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে হোটেল ইণ্টারকন কালো র‍্যাপারে ঢেকে দিয়েছিলো খোকা, খোকা গুণ্ডা, গুণ্ডা আর কোল্ড ব্লাড মার্ডারার। রাক্ষুসে আকাশ থেকে বস্তার মুখ খুলে রাশি রাশি ধাতব মুদ্রা ঢেলে দিচ্ছে কেউ মাথার উপর, কানের পাশে বৃষ্টির মর্মান্তিক কলরোল, ভয়ংকর এবং প্রচণ্ড, কানে তালা লেগে যায় খোকার। কি বিশ্রী কি জঘন্য এই নামটা! তার আসল নাম অর্থাৎ জাহেদুল কবির এই খোকা নামের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে যায় বারবার। ভোজবাজির মতো এমনভাবে শিকড় গেড়ে গ্যাঁট হ'য়ে আছে নামটা, যে, কখনো তার মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়। তলে তলে বজ্জাতি আর নষ্টামির শক্ত বর্মের কাজ করে এই নামটা। নাম তো নয়, একটা বিষের ভাঁড়। 'ক্ষুদ্র মাকড়সা নিজ হইতে সুতা ও

জাল সৃষ্টি করিতে সমর্থ, সৎ সেরূপটি পারেন না, যদি সৎ নিজেকে বিকৃত না করেন তবে সৃষ্টি হয় না' খোকার ভিতরের ঘোঁট পাকানো ঝড়ে ভুশ ভুশ ক'রে ধুলো উড়তে থাকে ; জোড়া ঘোড়ার চালে প'ড়ে মার খাচ্ছে এবার। ছেঁড়া কাগজের মতো ফরফর ক'রে উড়তে থাকে খোকা ; যৌবন এমন ক্ষমাহীন কেন, সে শুধু তার আপন অধিকার খুঁজে বেড়ায়, এক অসতর্ক মুহূর্তে অন্যায়েরও একটা অধিকার আবিষ্কার ক'রে ফেলে সে। কি ভাবে নীলাভাবী এখন? জেনে দেখলে কি হয়? নীলাভাবীর উত্তরটা কি ধরনের হবে? আর যদি ধ'রে নেয় একজন লম্পট কামাচারী নিছক কূট উদ্দেশ্য হাসিল করার ফিকির এঁটে নতুন ক'রে উস্কে দিচ্ছে, তাহলে উল্টো বিপদ। ঠিক সেইদিন থেকে তার মানসিক স্থৈর্যের পাট ভাঙ্গা লাট খাওয়া অবস্থা যেদিন সামান্য একটু আস্কারা পেয়ে নীলাভাবীর সারা বয়েস দুহাতে ঘাঁটাঘাঁটির পর একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছিলো সে, এবং খোকা খুব ভালো ক'রেই জানে এসব অন্য কারো বোঝার ব্যাপার নয় ; যেমন নীলাভাবী। সেদিন সেই আকস্মিক ছন্দপতনের পরও বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটেনি নীলাভাবীর চলনে-বলনে, খোকার মনে হয়েছে এক অপ্রত্যাশিত নিপুণতায় সমানে সূক্ষ্মতর ভারসাম্যও রক্ষা ক'রে চলেছে নীলাভাবী। নিজেকে লাগসই ক'রে মানিয়ে নেওয়া, নিজেকে ঠেলেঠুলে চালিয়ে নেওয়ার ভিতর আড়ষ্টতা না থাকাটাই সম্ভবত বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা, নিদেন পক্ষে এই ধরনের একটা হালকা সাদা প্রবোধ খাড়া ক'রে স্বস্তির উৎসমুখের দিকে যায় খোকা ; জেলিফিশের মতো এই থলথলে মেরুদণ্ডহীন স্বস্তির গায়ে থুথু ছিটিয়ে কোনো লাভ নেই, দুর্গন্ধময় হাজতের ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চায় খোকা, তোমরা যারা আমার পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের উদ্দেশ্যেই বলা : পৃথিবীর সকল নীলাভাবীরাই এক একটি জ্বলন্ত কামকুণ্ড, ফুটন্ত টগবগে আগ্নেয়গিরি, যার নিদারুণ লাভাস্রোতে পীত ধবল কালো

বাদামী রাশি রাশি খোকার দগ্ধাবশেষ গড়ান খেয়ে চলে।

ভিতরের সব ঝনৎকার থেমে যায় এক সময়, খোকা বললে, 'ব্যাস ব্যাস, থামো থামো—' মিউজিক কলেজের কাছে নেমে গেল খোকা।

কিছুক্ষণ কড়া নাড়ানাড়ির পর দরোজা খুলে দিলো সিদ্দিকা ভাবী, নীলাভাবীর সতীন। বয়েস গড়িয়েছে ঢের, প্রায় রাজীব ভায়ের সমবয়েসী মনে হয়।

'কে খোকা নাকি? ভিতরে এসো।' দরোজা বন্ধ ক'রে সিদ্দিকা ভাবী বললে, 'অসুখ-বিসুখ ছিলো বুঝি?'

'কই না তো!'

'অনেকদিন এমুখো হওনি, তাই বলছি—'

'সময় পাইনি।'

'চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়েছো বুঝি?'

'কই আর!'

'বোনটাকে তো একবারও নিয়ে এলে না?'

'আনবো আনবো ক'রে হ'য়ে ওঠে না আর কি!'

'হবে-ও না কোনোদিন, তোমরা সব এক রসুনের গোড়া।'

একটা টুলের উপর টেবিলফ্যান চড়িয়ে সেটাকে চালিয়ে দিলো সিদ্দিকাভাবী। কাজের ভিতর থেকে কথা বলাটা সিদ্দিকাভাবীর পুরোনো অভ্যেস; নিছক কথার প্রয়োজনে কখন-ও সময় খরচ করতে চায় না। খাটের তলা থেকে একটা পিকদান টেনে বের করতে করতে কিছুক্ষণ পর বললে, 'খেয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি তো?'

'হ্যাঁ, সোজা বাড়ি থেকেই আপনাদের এখানে আসছি।'

'বোসো তা'হলে, তোমার নীলাভাবী কুয়োতলায়—'

উঠোনের দিকের দরোজার পর্দাটা ভালো ক'রে টেনে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চ'লে যায় সিদ্দিকাভাবী। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে খোকা। সিদ্দিকাভাবীর সামনে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে সে, মনে হয় অতি অল্পকালের মধ্যেই তাকে শিউরে উঠতে হবে। এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় হাঁড়ির ভাত টিপছে, তারপর মাড় গালবে।

একজাতের স্ত্রীলোক আছে যারা কেবল একজন পুরুষের নিছক স্ত্রী হবার মন নিয়েই জন্মায়। উচ্ছেভাজা, মিষ্টি কুমড়োর ঘণ্ট, শজনে ডাঁটার ঝোল, এসবে তাদের হাত পাকানো থাকে। সেলাই-ফোঁড়, পুরানো শাড়ি কাপড়ের বদলে কাপ-ডিশ কেনা, বছর না ফুরোতেই বাচ্চা বিয়নো, দিব্যি ডুবে থাকে এই সবের ভিতর। ঠিক এই গ্রুপে পড়ে না সিদ্দিকাভাবী। বরং বলা যায়, একটা জ্বলজ্যান্ত হেঁয়ালি ; মাড়িচাপা এবং ভিতরগোঁজা কিসিমের। সাতেও নেই পাঁচেও নেই, ওপর থেকে কতকটা এই রকমই, অথচ গোটা সংসারকে অতি সহজে শক্ত মুঠোর ভিতর পুরে রেখেছে।

ঘরটা থমথমে। ছোট্ট একটা মেয়ে ঘামে চাবচুব হয়ে খাটের একপাশে ন্যাতার মতো প'ড়ে আছে, নাল গড়াচ্ছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। খুব সম্ভব পড়শীদের কোনো মেয়ে, নীলাভাবীদের কারো কোনো সন্তানাদি নেই। ঝুপঝাপ পানি ঢালার শব্দ আসছে কুয়োতলা থেকে। থেমে থেমে আবার গুনগুনিয়ে উঠছে নীলাভাবী। কাঁচের চুড়ি বাজছে। দু'হাত ভরা কাঁচের চুড়ি নীলাভাবীর। কাঁচের চুড়ি পরার বেজায় শখ ; হামেশাই কুটকাট ক'রে ভাঙে আর মন খারাপ হয়, সেই জন্যেই এতো অনুরাগ নীলাভাবীর।

রঞ্জুকে আনতে হবে একদিন। বলেও দেখেছে একবার রঞ্জুকে ; গায়ে না মেখে সে উড়িয়ে দিয়েছে। 'তোর খাতিরের জায়গা, আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন' মুখের ওপর বলেছিলো রঞ্জু।

কেমন যেন রুদ্ধশ্বাস, মুখোশপরা এই বাড়িটা ; সব সময় গুমোট, ভ্যাপসা গরম। চাপা অসন্তোষের অনচ্ছ আচ্ছাদনের ভার সহ্য

করতে না পেরে থেকে থেকে কাতরাচ্ছে বাড়িটা, অহরহ তুলতুলে ভয় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে ; ভালো-ও লাগবে না হয়তো রঞ্জুর। এ বাড়িতে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো নীলাভাবী। নীলাভাবী না থাকলে শ্মশানপুরী হ'য়ে যেত বাড়িটা।

'খোকাবাবু যে, কখন এলে ?'

'এই তো, কিছুক্ষণ !'

'পথ ভুলে বুঝি ?'

'কতকটা তাই—'

মাথার সপসপে চুলে লাল গামছা জড়িয়ে রোদ থেকে তোলা গুচ্ছের কাপড় পাঁজা ক'রে নীলাভাবী ঘরে ঢুকতেই সবকিছু বদলে গেল। কি স্নিগ্ধ নীলাভাবীর মুখ ! না-কি গোশল করার পর সবাইকেই অমন মনে হয়। দেশটাকে খোলামকুচির মতো হাতে পেলে পুরো ঢাকা শহরটাকেই একটা হামামখানা বানিয়ে দেওয়া যায়, মনে মনে পরিকল্পনা তৈরি করে খোকা।

'খুব বুঝি দেশোদ্ধার ক'রে বেড়াচ্ছো ?'

'কই আর—'

'কেন, এখন তো সকলের ঐ একই কাজ !'

'তুমি তো জানই নীলাভাবী, আমি সকলের দলে পড়িনা—'

'পড়ো ঠিকই, জানতে পারো না ! সারা দেশ কিভাবে গজরাচ্ছে !'

রান্নাঘর থেকে সিদ্দিকাভাবীর গলা শোনা গেল, 'এক গ্লাস শরবত তৈরি ক'রে দাও ওকে—'

'একটু বোসো, চটপট গোছগাছ ক'রে নি, তারপর তোমার শরবত—'

খোকা খ'চে উঠলো। বললে, 'নিকুচি করি তোমার শরবতের, দিনটাই আজ মাঠে মারা গেল। এই এক জঞ্জালে জীব মেয়েলোক ! আজ বরং চলি।'

'একেবারে ঘোড়ায় চ'ড়ে এসেছো দেখছি, ব্যাপার কি ?'

'কোথায় একটু ফ্রি থাকবে, আড্ডা মেরে ঘচাং ক'রে কেটে পড়বো, তা' নয়, যত্তোসব উড়ো ঝক্কি। চুড়ি বাজিয়ে গোশল করা, শুকনো কাপড় ভাঁজ করা, চুলঝাড়া, রাবিশ রাবিশ !'

নীলাভাবী হেসে বললে, 'তুমি এসেছো বুঝেই চুড়ি বাজাচ্ছিলাম, কি বুঝলে ?'

'বুঝেছি—'

'কচু বুঝেছো, যা একখানা মাথা তোমার ! যাও, আমার ঘরে গিয়ে পাখা ছেড়ে দিয়ে আরাম ক'রে বোসোগে, চটপট সব সেরে আমি এই এলাম ব'লে—'

'শালার বাড়িটা যেন পাখার একটা জীবন্ত বিজ্ঞাপন—' খটটাই মেজাজে বললে খোকা।

নীলাভাবীর ঘরটা এ বাড়ির ভিতর একেবারেই আলাদা। কোথাও কোনো খুঁত নেই, পরিপাটি ক'রে সাজানো-গোছানো, চকচকে-তকতকে, সামান্য একটু আঁচড়-ও পড়েনি দেয়ালের কোথাও। মনে হয় এই ঘরটার সঙ্গে বম্‌কে থাকা বাড়িটার কোনো সম্বন্ধ নেই ; থাকলেও তা এমন-ই জটিল এমন-ই গোলমেলে যে সে সম্পর্ক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বরং ঘুরিয়ে বললে বাড়িটাই একটি স্ববিরোধ হ'য়ে যায়।

এ ঘরে অধিষ্ঠান যার, সে যেন সহসা কোনো সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে রহস্যময় কারণে পৃথিবীতে আবির্ভূত ; কিলবিলে থুকথুকে নোংরা আশ্রয়কে সে স্বপ্নের ভিতরে নিয়ে যায়। বিছানাটা দেখলে বোদলেয়রের সেই 'প্রবল-মধুর' আলস্যময় বিড়াল কবিতাগুলির কথা মনে পড়ে যায়।

'ধরো—' পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে শরবতের গ্লাস বাড়িয়ে ধরে নীলাভাবী। বললে, 'খালি চিনি কিন্তু, ঘরে লেবু নেই—'

'নিকুচি করি আমি লেবুর! এবার থেকে টিকিট কেটে দেখা করতে আসবো তোমার সঙ্গে!'

'এতদিন বিনা টিকিটে আসছিলে, না পাসে?'

'খচড়ামি রেখে খাওয়াটা সেরে এলেই খুশি হতাম!'

'তবে কি?' নীলাভাবী একগাল হেসে বললে, 'তোমার জন্যে ব'সে আছি নাকি পেটে পাথর বেঁধে? পুরুষমানুষের গোশল করা আর মেয়েমানুষের খাওয়া—সময় বেশি নিলেই অখ্যাতি। পাঁচ মিনিটের বেশি কখনোই আমার লাগে না!'

'কথা না বাড়িয়ে গিলে এসো না বাবা!'

নীলাভাবী হেসে বললে, 'হুবহু নকল তোমার রাজীব ভায়ের, কথা বলার ঢংটি পর্যন্ত!'

'সত্যিই বলছো খেয়ে এসেছো?'

'সত্যিই! তুমি তো আর আমার গুরু নও, তোমায় ফেলে খেতে দোষ নেই—'

'গুরু আবার কি?'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে একদিন শিখিয়ে দেওয়া যাবে—'

'বলো কি, শেখারও আছে আবার, গ্যাঁড়াকল তো মন্দ নয়।'

'শেখার আছে বৈ কি, সব ব্যাপারেই শেখার আছে। সব ব্যাপারেই রীতিমতো সুশিক্ষা দরকার, বুঝলে?'

'এতক্ষণ ঠিকই বুঝছিলাম, কিন্তু ঐ যে জোর দিয়ে "বুঝলে" ব'লেই সব কাঁচিয়ে দিলে!'

'এক একটা ব্যাপারে এক একজনের কাছে শিক্ষা নিতে হয়। অনেক ব্যাপারে তোমার হাতেখড়ি ভালো মাস্টারের কাছে হয়নি। তরল?'

'তরল।'

'কিন্তু ফিক ফিক ক'রে হাসিটা কেন?'

'সন্দেহটা কেটে গেছে এই আর কি। "অনেক ব্যাপারে" কথাটা এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে—'

'বুঝেছি, এইজন্যেই তোমার সরেস মাথাটার এতো প্রশংসা করি সব সময়। ব্যাপারটা কি রকম হ'লো জানো, পানের ভেতরে চুন খয়ের সুপুরির সঙ্গে একটিপ আসল জিনিস—মানে কোকেনও চালান ক'রে দেওয়া হ'লো গালে—'

'রাজীব ভায়ের বোধহয় দেদার চলে ওইসব ?'

'আগে চলতো, এখন বদভ্যাসটা ছেড়ে গেছে।'

'মানে তুমি ছাড়িয়ে দিয়েছ ?'

'কি ক'রে বুঝলে ?'

'ঐ যে অভ্যেস না ব'লে বদভ্যাস বললে !'

'মাঝে মাঝে তোমার বুদ্ধিটা এমন খোলতাই হ'য়ে যায় !'

'তোমার কাছে এলেই দারুণ কাজ করতে থাকে আমার ব্রেন, তুমি হচ্ছো যাকে বলে একেবারে খাঁটি ব্রেন-টনিক।'

নীলাভাবী হঠাৎ কেমন যেন মনমরা হ'য়ে যায়। চোখমুখে গাম্ভীর্য ছায়া ফেলে। নীলাভাবীর চেহারায় কোথায় একটা ধার আছে, মনে হ'তে থাকে খোকার।

'একটা কথা জিগেশ করবো ?'

'ভড়কে দেবার কোনো মানে হয়না—'

'আজকাল ইচ্ছে ক'রেই তুমি এ বাড়ি মাড়ানো ছেড়ে দিচ্ছো। খুব হিশেব ক'রে পা বাড়াচ্ছো সব সময়, ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে গুটিয়ে নিচ্ছো নিজেকে—'

'স্রেফ বাজে কথা !'

'এ বাড়ির কেউ তোমাকে কিছু বলেছে নাকি ?'

'বলেছে।' খোকা কিটকিট ক'রে হেসে বললে, 'বলেছে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যাকে বলে একেবারে তুলোধোনা ক'রে ছাড়বে !'

'মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে মানে ?' একরোখা জেদি ভঙ্গিতে জিগেশ করলে নীলাভাবী।

'লেব্বাবা, এ-যে দেখি উকিলের জেরার-ও কান কাটে !'

'কি ব্যাপার খুলে বলো—' নীলাভাবী হাত চেপে ধরলো।

'মারবে নাকি? গ্যাঁড়াকল তো মন্দ নয়!' খোকা একটু থেমে তারপর বললে, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারছি। ইচ্ছে ক'রেই আসিনা ,আসা হয়ে ওঠে না—'

'তবে আগে যে বলতে আমার জন্যে তোমার মন কাঁদে, না দেখে থাকতে পারো না?'

'আসলে তোমার মনের কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দিয়েছিলাম—'

'চালাকি মারছো?'

'বুঝলে না—' খোকা বললে, 'ওটা ছিলো তোমাকে ফাঁসাবার একটা কায়দা, যাকে বলে স্রেফ ধাপ্পা!'

'বিশ্বাস করিনা, বুজরুকিটা মারছো এখন!'

'বিশ্বাস না করার কি এমন আছে এতে?' অসহিষ্ণু হ'য়ে খোকা বললে।

'আমি খুব ভালো ক'রেই জানি সেসব কথা নিছক বুজরুকির ছিলো না। তোমার মুখে আমি কষ্টের ছাপ দেখতে পেতাম সে সময়, কোনো লাভ নেই অস্বীকার ক'রে। এখন তোমার সে চেহারা আর নেই। এতো অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কতো বদলে গিয়েছো, আশ্চর্য!'

খোকা মটমট ক'রে আঙুল মটকে বললে, 'আমার চর্বি হয়েছে, ভরাপেটে শুধু ঢেকুর উঠছে—'

'এত চাপা স্বভাব তোমার! আজ আমি উত্তর না নিয়ে তোমাকে ছাড়ছি না মনে রেখো!'

'ঘাট মানছি বাবা! আসলে কি জানো, আমার মেটামরফসিস হয়েছে; আমি শালা গ্রেগর স্যামসার মতো বিটকেল পোকা বনে গিয়েছি। সবই ওই ব্রেন-টনিকের গুণ, যে রেটে ঝেড়ে টনিক চালাও তুমি—'

'তোমার মগজে নতুন একটা কিছু ভর করেছে, আমি কিছুটা

আন্দাজ করতে পারি !'

'অত-ই যখন বোঝো তখন ঘটা ক'রে এতো বাজিয়ে দেখার কি আছে ! তোমার চোখ তো আর চোখ নয়, এক্স-রে মেশিন, মগজ এস্তেক দেখতে পাও ।'

'তোমার ওই কূট-কচালে ভাবনা-চিন্তাগুলোকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করো, তাতে তোমার নিজেরই উপকার হবে, জীবনে আনন্দের দাম নিছক কম নয় । নিজের সম্পর্কে মনের ভেতর কোনো গ্লানি পুষে রাখতে নেই, তুমি মূর্খ হ'লে এসব কথা তুলতাম না । নিজেকে, নিজের চিন্তা-ভাবনাকে, নিজের অভিরুচিকে কারা বোকার মতো ছোট ক'রে দেখতে অভ্যস্ত তা জানো ? যারা অগোচরে নিজের সর্বনাশ চায়—'

'থট রিডিং-এ মাস্টার হ'য়ে উঠেছো দেখছি ! থামলে কেন, চালিয়ে যাও—'

'সব কথায় বাগড়া মারো কেন ?'

'তুমি যখন এক নিঃশ্বাসে কথা বলতে থাকো—' খোকা নরোম ক'রে বললে, 'তখন অদ্ভুত দেখায় তোমাকে, তোমার ভেতর থেকে তখন অন্য কেউ কথা বলে । এরপর থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করতে হবে তোমাকে । এখানে একটা কথা আছে, আমি রাক্ষস-খোক্ষস নই, আমার হার্ট একটা চড়ুইপাখির চেয়েও হালকা, পালকের চেয়েও পলকা, এত বেশি ক'রে সত্যের ব্যবচ্ছেদ না করাই ভালো, আমার ভেতর কেঁপে ওঠে, ট'লে যায়—'

'তোমার কাছে বোধহয় সিগ্রেট নেই, আনিয়ে দেবো ?'

'সিগ্রেট আছে ।'

'আছে তো টানছো না কেন ?'

'দরকার মনে করিনি এতক্ষণ !' কথাটা শেষ ক'রেই যন্ত্রচালিতের মতো সিগ্রেট ধরায় খোকা । ফুলস্পীডে পাখা চলছিলো ব'লে তেরোটা কাঠি খরচ হ'লো দেশলাই-এর ।

কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার শুরু করলে নীলাভাবী, 'তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক, আর কেনই বা তা, খুলে বলতে হবে আজ তোমাকে। তোমার মাথার ভেতরে বহুৎ আবর্জনা জমে আছে, সাফ করা দরকার—'

বাধা দিয়ে খোকা বললে, 'বুঝেছি, আজ শালার গলা পানিতে না চুবিয়ে তুমি ছাড়বে না, রয়ে রয়ে স্রেফ প্যাঁচের ভেতরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যাচ্ছেতাই! তোমার যা খুশি অনর্গল ব'কে যেতে থাকো, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কোনো জবাব পাবেনা।'

'জবাব দেবার মুরোদ থাকলে তো জবাব দেবে! আমি জানি এসবের কোনো একটারও জবাব তোমার নিজের জানা নেই।' নীলাভাবী কোমর বেঁধে শুরু করলে এবার, 'সত্যি, এক একটা ছোট-খাট ঘটনায় এমনভাবে চোখ খুলে যায়, ভাগ্যিশ তোমার দেখা পেয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, তা না হ'লে যথেষ্ট বিপদ ছিলো আমার নিজেকে নিয়ে। তোমার হয়তো কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হবে না, নিজেকে নিয়ে নিজের কাছে এখন কোনো সমস্যাই নেই আমার। এসব সহজে বিশ্বাস করতে কেউ বড় একটা চায়-ও না। কেন চাইবে, অকারণে রাজ্যির যতো জঞ্জাল জড়ো করাটা যখন মানুষের জন্মগত দোষ, সেখানে এটাই তো স্বাভাবিক। আমি খুব ভালো ক'রেই জানি, নিজের সম্পর্কে আমার ধারণাগুলো কড়ায়-ক্রান্তিতে নির্ভুল। নিজেকে জটিল অঙ্কের শামিল ক'রে ফল মেলাতে না পারার মতো মর্মান্তিক আর কিছু নেই; ঘৃণা করি আমি এইসব বানোয়াট জটিলতাকে। দৈব-দুর্বিপাকেও যদি আমাকে তার ধারালো খপ্পরে পড়তে হয়, আমি গা বাঁচিয়ে, নিজের শরীরে একটি আঁচড়ও না লাগিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। বুঝিনা, সংসারের সবাই সবকিছুকে সহজে নিতে পারে না কেন। সহজভাবে নিতে না পারলেই সবকিছু কেমন ভারি মনে হ'তে থাকে—'

এই পর্যন্ত এসে থামলো নীলাভাবী। যতদূর আন্দাজ করতে পারে খোকা তাতে তার মনে হয় এটা একটা ভূমিকা মাত্র। নীলাভাবীর চোখ মুখ চলকে উঠছে, একটা কিছু প্রবলভাবে তোলপাড় ক'রে চলেছে ভেতরে ভেতরে; অসংখ্য পলকাটা একটা নীলকান্ত মণির মতোই রহস্যময় দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে অন্তস্তল থেকে।

'খোকা, তুমি জানো বা না জানো, আজ মুখ ফুটে একটা কথা তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করবো, সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি—'

এ কথায় বড় বড় চোখে তাকালো খোকা ; তার ধারণা ছিলো একমাত্র বইপত্রেই এইসব কথা স্থান পায়; কিংবা যখন মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে তখন 'ব্লাউসের বোতাম খুলতে ভালবাসির' বদলে ওই কথা ছাপা হয়।

'কবে থেকে জানো ? মনে ক'রো না একেবারে সেই প্রথম দিন থেকে। প্রথম যেদিন তুমি তোমার রাজীব ভায়ের সাথে এ বাড়িতে এলে, তখন তো আমি তোমাকে দেখে প্রায় হেসেই ফেলেছিলাম। এককালে ওনার কোকেন খাওয়ার মতো বড়শিতে মাছ ধরারও বেজায় নেশা ছিলো। আমার মনে হ'লো নেশাটা আবার চাগান দিয়েছে, সঙ্গে তাই অমন একটা লিকলিকে ছিপ—'

বাধা দিলে খোকা। বললে, 'ছিপই-তো ! ছিপ না হ'লে কি আর মাছ গাঁথে ?'

নীলাভাবী গায়ে মাখে না। স্বপ্নের ভেতর ঢিল খেয়ে হঠাৎ ঝটপট উড়ে যাওয়া পায়রার ঝাঁক আবার এসে বসে। নীলাভাবী বলতে থাকে, 'যেদিন তুমি প্রথম অকপটে বললে, আমার জন্যে তোমার মন কাঁদে, আমাকে না দেখে তুমি থাকতে পারো না, সেদিন আমার মনে গভীর একটা দাগ কেটে দিলে তুমি। মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম তোমার স্বীকারোক্তিতে ; যেন অনেকদিন থেকেই এমন একটা কিছুর জন্যে ভেতরে ভেতরে অপেক্ষা করছিলাম। এত দ্রুত ঘ'টে গেল সবকিছু ! এক সময় আমি জিগেশ

করলাম নিজেকে, এটা কি আমার পক্ষে ঠিক হচ্ছে? আমার আছে স্বামীর দায়ভাগ। নিজেকে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী ভাবতেও ঘৃণা হয় আমার। পরস্পরকে ভালবেসেই আমরা বিয়ে করেছিলাম, এখনো ভাবতে পারি না তাতে চিড় খেয়েছে। তোমাকে নিয়ে এইভাবে আমি অনেক ভাবলাম। যতোই ভাবি, তুমি আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসতে থাকো, সে এক নিদারুণ অবস্থা আমার। শেষে জিদ ধরলাম নিজের সঙ্গে, একান্তই যদি তোমার ওপরে আমার একটু টান প'ড়ে থাকে, কি এমন অপরাধ তাতে! আর আগুন যখন আমার নিজেরই হাতে, গোটা সংসার ছারখার হবার ভয়টা কোথায়! নিজের হাতে, মানে, নিজের আয়ত্তে। সুবিধে এখানে এই, তোমাকে আমার এমন কিছুও দিতে হবে না যাতে ক'রে দ্বিতীয় কারো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কিছুই নেই আমার দেবার মতো, ওদিকে এমন কিছুও তুমি আমাকে কোনোদিন দিতে পারবে না যাতে ক'রে আমার স্বামীর এই বয়েসে প্রাণান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার সম্ভাবনা দেখা দেবে। আমাকে দেবার মতো তোমার কিছুই নেই একথা কেন বলছি তুমি নিশ্চয়ই তা বুঝবে—'

একটু থেমে, ঢোক গিলে, নীলাভাবী বললে, 'অনেক কিছুই আছে, কিন্তু নিজের যোগ্যতা বিচার করলে দেখা যায়, যাকে বলে সত্যিকারের নেবার যোগ্যতা, এখন আর তা আমার নেই। এই যোগ্যতার মাপকাঠিতে ফেলে নিজেকে যাচাই ক'রে দেখতে পেরেছিলাম ব'লেই সবকিছুর এমন সহজ মীমাংসা সম্ভব হয়েছিলো। মনে ক'রে ব'সো না আবার স্রেফ বিনয়ের ব্যভিচার হচ্ছে। অনেক রকমে ঘাঁটাঘাঁটি ওলট-পালট ক'রে দেখলাম, এক ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নেবার নেই আমার। ক্ষণিকের তাড়নায় কিংবা ভুলক্রমে যা কিছু ঘটে ঘটুক, আমি তাকে হিশেবের মধ্যেই ফেলি না। অসম্ভব দুর্বলচিত্ত ছেলে তুমি। কোনো কিছুই তোমার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাধীন নয়। ইচ্ছে করলে লুট করতে পারতাম; ফতুর

ক'রে ছেড়ে দিতে পারতাম? কিন্তু কি লাভ, কি লাভ হতো তাতে? তোমার কিংবা আমার? লুটের মাল দিয়ে নিজেকে সাজাতে চাই না, ঐশ্বর্য মনে করি উপহারকে। এসব কথা হেঁয়ালির মতো মনে হ'তে পারে তোমার, এটাই স্বাভাবিক। যে কোনো একটা ব্যাপারকে উল্টোভাবে খতিয়ে দেখার মতো মনের জোর সকলের থাকে না। দুঃখে আমার ভয় নেই। জীবনে দুঃখ পেতে হয়। দুঃখের এই একটা চরিত্র, সে সুযোগ পেলে পিষে ফ্যালে বটে, শেখায়ও প্রচুর; সাহস ক'রে, মাথা উঁচু রেখে, বুক টান ক'রে যারা তার মুখোমুখি দাঁড়ায় তারা কেউ কখনো খালি হাতে ফেরে না। এসব কথা আর একদিন হবে। সত্যি, আমি ওর জীবনটা ফতুর ক'রে ছেড়েছি। এখন একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। বুঝলে তো, তোমার রাজীব ভায়ের কথা বলছি। লোকে জানে ছেলেপিলে না হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে লোকটা; আমরা নিজেরাও কতকটা ওই ধরনের হাবভাব দেখাই। স্রেফ ধাপ্পাবাজি! প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিলাম দু'জনে, তল পাচ্ছিলাম না; কূল পাচ্ছিলাম না; ডুবে মরতে মরতে কোনো রকমে ডাঙায় এসে ভেড়া—মানে বিয়ে করা। তা না হ'লে মরেই যেতাম, কি, খুব যে কিটকিটিয়ে হাসা হচ্ছে?'

'হাসবো না তো কি কাঁদবো?'

'বিশ্বাস হচ্ছেনা নিশ্চয়ই?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? আগাগোড়া একটা ব্যাপারকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার জন্যে যেভাবে কসরৎ ক'রে চলেছো তাতে বিশ্বাস না করলে রক্ষে থাকবে! বলিহারি বাহাদুরি তোমার!' খোকা পা লম্বা ক'রে বললে, 'থামলে কেন, চালিয়ে যাও, নিদেন পক্ষে টেকনিকটা তো রপ্ত হবে।'

'ডেঁপোমি করবে না ব'লে দিচ্ছি! আমার কথা শেষ করতে দেওয়া তোমার ইচ্ছে নয়, ভেবেছো আমি তা বুঝি না?'

'ঠিক'হায়, ঘাট মানছি—'

'যা বলছিলাম। হ্যাঁ, আমাদের বিয়েটা ছিলো সত্যিকারের প্রেমের। ও তখন এক বিদেশী ফার্মে চাকরি করছে। পাথর হাতড়ায় আর বই-পত্তরের ভেতর মশগুল হ'য়ে থাকে। একটু দাঁড়াও, গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু—'

'দাঁড়াতে হবে?'

'হ্যাঁ, তেরো বছর আগেকার কথা সেসব। আমার বয়েস তখন আঠারো, ওনার ছত্রিশ কি সাঁইত্রিশ—'

'মানে ফারিন স্টাইলের লভ আর কি!'

'যা বলো তাই। সুন্দর গাইতে পারতো ও, ক্লাসিক্যাল চর্চা করতো ও; এস্রাজ-ও বাজাতে পারতো—'

'হুঁ, ক্লাসিক্যালে বেজায় সুবিধে—' 'বাধা দিয়ে খোকা বললে, 'ঘোড়েল লোক!'

'শুধু তাই নয়, হুদ্দাড় ক'রে মুখে মুখে এমন সব গল্প বানাতে পারতো যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যেত।'

'হাইজাম্প, লংজাম্প, এসব?'

'না ওসব নয়, তবে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো হাত সাফাই-এর খেলা, ম্যাজিক, এসব জানতো।'

'ব্রাদার আমার জাত ম্যাজিশিয়ান!'

'ওর মতো প্রাণোচ্ছল স্পষ্ট তেজী মানুষ আমার আর চোখে পড়েনি।'

'চোখে যে ঠুলি লাগিয়েছিলে, তা না হ'লে আসল ব্যাপারটাই ধরা পড়লো না কেন? সবকিছু ছিলো নিছক ভাঁড়ামি, ছুকরি পটাবার কায়দা।'

'হিংসে হচ্ছে বুঝি? ওই নোংরা জিনিসটার বালাই ওর ভেতরে একদম নেই। ওকে পাবার জন্যে হন্যে হ'য়ে উঠছিলাম আমি

নিজেই। তুমি বিশ্বাস করবে না খোকাবাবু, ওর এক একটা কথায় কিভাবে চলকে উঠতাম। এতো অদ্ভুত এতো সুন্দর কথা বলতো ও! ওর মুখের কথা শুনে শুনে আশ মিটতো না আমার!'

'দেদার কোটেশান ঝাড়তো নিশ্চয়ই?'

'কক্ষোনো না—'

'বলছো কি, তা'হলে দৃষ্টিপাত পড়েনি বলতে চাও?'

'ওকে তুমি চেনোই না—'

বাধা দিয়ে খোকা বললে, 'ও ও না ক'রে সরাসরি নাম ধ'রেই বলো না কেন! আধুনিকারা তো তাই করে। খোকাবাবু খোকাবাবু ডাকটাও ছাড়তে হবে, ওটা গালাগালির মতো শোনায়—'

নীলাভাবীর চোখজোড়া স্বপ্নালু হ'য়ে এল। বললো, 'আমি আর এখন আধুনিকাদের দলে পড়ি না। সত্যিই কি ছিলো মানুষটা, আর আজ কি দশা হয়েছে। কিছুদিন থেকেই চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না, বড় স্বার্থপর নীচ মনে হচ্ছিলো নিজেকে; আমি জানি মানুষটার ওই ধ্বসে যাওয়া, হুমড়ি খেয়ে পড়া বিশ্রী দলার জন্যে আমিই দায়ী। ওর সবকিছু আমিই সাবাড় ক'রে দিয়েছি। ফতুর ক'রে দিয়েছি ওকে। আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই সেই খাড়া একরোখা মানুষটার; যেন একটা পুরানো থলে, ভিতরটা শূন্য, ফেঁসে যাওয়া, প'ড়ে আছে একপাশে—'

চোখের কোণে পানি চিকচিক ক'রে উঠলো নীলাভাবীর। রাণী অশ্রুমতি সহসা এমন উতরোল হ'য়ে উঠলো কেন, খোকা ভাবতে চেষ্টা করে। আর এতো কিছু থাকতে থলের উপমাটাই বা ঠোঁটে এলো কেন, তারও হদিস পায় না সে; ফেঁসে যাওয়া, প'ড়ে আছে একপাশে, কুচ্ছিত শোনায়।

'মানুষটার দিকে তাকালে কষ্টে বুক ভেঙে যায়। অথচ ইচ্ছে করলে, সময় থাকতে সতর্ক হ'লে, আমি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে

পারতাম। প্রথম থেকেই ওকে আনতাবড়ি খরচ করার ব্যাপারে সাবধানী হওয়া উচিত ছিলো। তা না ক'রে দু'হাতে কেবল উড়িয়েছি ওকে বাপ-দাদার জমিদারির মতো। বেমালুম ফুঁকে দিয়েছি সব। কোনোদিন টেরও পেলো না দিনের পর দিন আমার বেহিশেবী হাতে খুচরো পয়সার মতো কিভাবে ফৌত হ'য়ে যাচ্ছে। এখন যদি বলি, একটা গল্প শোনাও, সাধ্যমতো চেষ্টা করবে, কিন্তু পারবে না, বলবে আজকাল আর ওসব মাথায় আসেনা, মাথার ভিতরটা ফাঁকা হ'য়ে গিয়েছে, কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় সব; আসলে বুড়িয়ে গিয়েছি, বয়েস তো আর কম হয়নি। বললে কি হয়, আমি খুব ভালো ক'রেই জানি ওটা নিছক একটা অজুহাত মাত্র। ওর মন এখনো যথেষ্ট সতেজ, তোমার চেয়েও। এস্রাজের অভ্যেসটা টেনেটুনে কোনোরকমে বজায় রেখেছিলো অনেকদিন পর্যন্ত কিন্তু বাগড়া পড়লো সেখানেও। একটা গৎ ধরার পর কাছে গিয়ে বসতাম, বলতাম নতুন কিছু একটা বাজিয়ে শোনাতে; কখনো ভেবে দেখিনি নতুন কিছু ও শোনাবে কোত্থেকে! যতটুকু অবসর পায় তার সবটুকুই থাকে আমার দখলে, আর এই লোভেই আমি সংসারের মোহ গায়ে মাখিনি, মনের আনন্দে সংসারের দখলদারি ঠেলে দিয়েছিলাম আরেক দিকে। অবসর সময়ে আমি ওকে পান-দোক্তার মতো মুঠোর ভিতরে পুরে রাখি, আমার হাতের তালুর চাপে ও ঘেমে ওঠে, কিছু বলতে পারে না কখনো মুখ ফুটে, আমার খুশিতেই ওর আনন্দ, অতএব বলবেই বা কেন। বলা নেই কওয়া নেই হুট ক'রে বেচে এলো একদিন এস্রাজটা। বললে, ভালোই হ'লো ওই একঘেয়ে কোঁ কাঁ আর কাঁহাতক ভালো লাগে, নতুন কিছু হাতেই আসে না। ল্যাঠা চুকলো যা হোক। সেদিন সারারাত আমি বালিশে মুখ গুঁজে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। আর কিছু রইলো না মানুষটার শুধু আমার জন্যে, কেবল আমার জন্যে—'

অঝোরে কাঁদতে লাগলো নীলাভাবী, সে কান্না কিছুতেই আর থামতে চায় না।

এই হাস্যকর নাটুকেপনার কি সত্যি কোনো মানে হয়?

খোকা মনে মনে খতিয়ে দেখলে, এই মুহূর্তে তার কিছুই করণীয় নেই। কোলের দিকে মুখ নিচু ক'রে আকাশ ভেঙে কেঁদে চলেছে নীলাভাবী; কখন যে কার ভেতর কোন রোগ চাড়া দেয় বোঝা দুঃসাধ্য। ঝাপটে ধ'রে একটা চুমু খেলেও এখন ভাবান্তর হবে না; কান্না ছাড়া পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আর কিছু ভালো নেই, নীলাভাবীর ভাবখানা এখন এমন। বন্ধুদের কেউ হ'লে নির্ঘাত চুমু খেতো এবং আদর করতো। ইয়াসিন তো খোলাখুলি বলেই অনেক সময়, বুড়ো বয়েসের আগে মেয়েমানুষকে যে শ্রদ্ধা করে কিংবা ধর্মকর্ম নিয়ে চাগিয়ে ওঠে সে ব্যাটা এক রামপাঁঠা, তাকে লৌড়ানো দরকার; মানুষের বুড়ো হ'য়ে না জন্মানোর পেছনে উপরওয়ালার বহুৎ খেয়ালখুশি কাজ করে।

পাখার বাতাস গরম হ'য়ে উঠেছে। বাইরের রোদ একটু একটু ক'রে বিকেলের দিকে গড়াচ্ছে। এক সময় শান্ত হ'য়ে এলো নীলাভাবী। বললে, 'তোমার মনটাই আজ খারাপ ক'রে দিলাম। কি আর করবো। অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে বলবো এসব, সত্যিই ভেতরে ভেতরে দারুণ হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ভালোই হ'লো একরকম, বুকের ওপর থেকে পাথরটা খানিক স'রে গিয়েছে। আজ আর তেমন কিছুই নেই তোমার রাজীব ভায়ের; এস্রাজ ম্যাজিক গল্প সবই এখন অন্য এক গল্প হ'য়ে গিয়েছে, অথচ একদিন শুতে যাবার আগে হাত নিশপিশ করতো মানুষটার, কিছুতেই ঘুম আসতো না, এস্রাজে ছড় বোলানো চাই, মানুষ খুঁজে বেড়াতো গল্প জমাবে ব'লে। যে অভ্যেসগুলোকে ও সবচেয়ে বেশি ভালবাসতো সেইগুলোই ওকে ছেড়ে চ'লে গেছে। তবু বেঁচে আছে মানুষটা। টিকে আছে। কিন্তু টিকে আছে কি ক'রে তা জানো?

ভালবাসাটা ওর স্বভাব, এখনো মরেনি সেটা। সব ওকে ছেড়ে গেছে, কিসের একটা ভারে দিন দিন ও ন্যুব্জ হ'য়ে যাচ্ছে. কিন্তু ওর ওই ভালবাসার স্বভাব এখনো ছেড়ে যায়নি ওকে।'

একটু থেমে খোকাকে একবার নিখুঁতভাবে জরিপ ক'রে নিলো নীলাভাবী ; তারপর খুব আচ্ছন্নভাবে বললে, 'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো তো ?'

'কিছু কিছু—' 'খোকার উত্তরে প্রচ্ছন্ন বিরাগ।

'এতসব কথার পর তোমার ঠিক বিশ্বাস হবে কিনা জানিনা—এস্রাজের চেয়ে, গল্পের চেয়ে, গানের চেয়ে ও আমাকে আলাদা ক'রে কখনো ভালবাসতে পারেনি, বেশ কিছু দিন পরে আমি একথা বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি বলবে তাহলে অন্য সবকিছুই যখন ছেড়ে দিলো মানুষটা, সেখানে তুমি টিকে গেলে কি ক'রে ! আমি তো আর ছিটের খোলে মোড়া কঙ্কালের মতো একটা এস্রাজ কিংবা ম্যাজিক দেখানো জারিজুরি করা তাসের প্যাকেট নই, যে ছেড়ে দিলেই অমনি ল্যাঠা চুকে যাবে। ও ছাড়লেও আমি তো আর ওকে ছাড়ছিনে ; এস্রাজ কিংবা তাসের প্যাকেটের সঙ্গে আমার তফাতটা শুধু এইখানেই। এখন যে ও সেই আগের মতো গল্প জমাতে পারেনা, গান গাইতে পারে না, তার জন্যে ওর কিন্তু কোনো খেদ নেই। দেখলাম এই নিয়ে যা কিছু মাথাব্যথ্যা সব একা আমার। রাজ্যির সব গ্রহরত্নের মধ্যে ডুবে আছে। ওই গ্রহরত্ন গ্রহরত্ন ক'রে ছেড়ে দিলো চাকরিটাও। তুমি শুনতে চাও আর না চাও পাথরের গল্প শোনাতে শোনাতে রাত ভোর ক'রে দিতে পারে ও এখন। একেবারে ওই জগতে তলিয়ে গেছে বলতে পারো। জানালার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় রেখে এক একটা পাথরের দিকে তাকিয়ে প্রায় সারারাত কাবার ক'রে ফ্যালে এখন। বলে মানুষের তৈরি জিনিস নিয়ে অনেকেই তো নাড়াচাড়া করে, এ হচ্ছে প্রকৃতির জিনিস, স্বয়ং খোদার হাতে তৈরি, এর

চেয়ে মহার্ঘ আর কি হ'তে পারে। আসলে এইসব ঘাঁটাঘাঁটি করার নেশা ওকে পেয়ে বসেছে; আর এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, ওটাকেই পেশা ক'রে দিনরাত রুজির ধান্ধায় বুঁদ হয়ে আছে। চাকরিতে ক'টা টাকারই বা সংস্থান হয় বরং এটা একটা স্বাধীন ব্যবসা; বাইরে থেকে ওর এই পেশাটাকে তাই ভীষণ একটা লাভজনক ব্যাপার ব'লে মনে হয়। কিন্তু আমি জানি, লাভের কথা ভেবে, অঢেল কামাই করার লোভে ও এ পথে পা বাড়ায়নি। টাকা পয়সার জন্য মাতলামি ওর স্বভাবে কখনো দেখিনি, বরং উল্টোটাই সব সময় মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে একটু বেশি রকমেরই উদাসীন। সব সময় এই যে গ্রহরত্ন গ্রহরত্ন ক'রে বুঁদ হ'য়ে আছে মানুষটা সেটা আর কিছু নয়, মদের মতো একটা নেশা। যা একদিন ওর স্বভাবে ছিলো গান গাওয়া, এস্রাজ বাজানো, সেই নেশারই অন্য চেহারা, যেমন একদিন ভালবাসতো আমাকেও। উৎস একটাই। মন উঠে গেছে ব'লে নিছক আত্মপক্ষ সমর্থন করার ফন্দি এঁটে পেট-বানান্তি কথার রাশ মেলে ধরছি, তুমি নিশ্চয়ই এই ধরনের একটা কিছু ভাবছো। বিশ্বাস করো, এসব কথার পিঠে স্রেফ কথা নয়, হঠাৎ কোনো মন কচলানির জেরও নয়। যা কষ্ট দেয়, যা খিচড়ে দেয় আমার মনকে, নষ্ট করে মনের শান্তি, তার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি ভালবাসি; চিরকেলে স্বভাব ওটা আমার। আগেই তো বলেছি, জীবনের জটিলতাকে আমি ঘৃণা করি, মনে প্রাণে ঘৃণা করি। দরকার হ'লে জট ছাড়িয়ে নিই, না পারলে চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে যাবার। পুরানো কথায় ফেরা যাক। নিজের টিকে থাকার প্রায়োজনেই ধ'রে নিতে পারো শেষ পর্যন্ত স্বামীর সবকিছুর এইভাবে ব্যবচ্ছেদ করতে হ'লো। যেটা আমার স্বভাব জিগেশ করলাম নিজেকে, স্পষ্ট জবাব চাইলাম নিজের কাছে। উত্তরও পেলাম। গান থেকে গল্প, গল্প থেকে এস্রাজ, এস্রাজ

থেকে আমি, শেষে গ্রহরত্ন ; আমি ভেবে দেখলাম ও ঠিকই আছে, ওর পিছনের দিকে তাকাবার অবসরই নেই। ওর প্রাণশক্তি আছে, একটা ছেড়ে আরেকটায় যাবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমার ? সবকিছু একটা প্রকৃতির ব্যাপার মনে হ'লো আমার। ভিতরের সব কষ্ট, সব খেদ, গ্লানি, যা এতদিন ঘোঁট পাকচ্ছিলো কেবলমাত্র স্বামীকে ঘিরে হঠাৎ তা ঝলমল ক'রে ঝল্‌সে উঠলো ; এইবার নিজেকে নিয়ে পড়লাম আমি। এতদিন পর নিজের জন্যে স্বার্থপরের মতো ব্যাকুল হ'য়ে পড়লাম, নিরাকার ভুতুড়ে আয়নার সামনে মেলে ধরলাম নিজেকে। রীতিমতো উল্টো ব্যাপার। এতদিন স্বামীর কথা ভেবে যতো খেদ স্তূপাকার করেছি, তা কেবল নিজের জন্যে, নতুন ক'রে জীবনের দিকে তাকাবার জন্যে। কি অবস্থায় এসে ঠেকেছি, আমি ভাবলাম, এ আমি কোথায়, দুর্দশার ভিতরে একেবারে গলা পর্যন্ত জুবড়ে প'ড়ে আছি ; এমন কি অবশিষ্ট আছে আমার ? উচ্ছিষ্ট ! কারো পাতে দেবার মতো নয়, উল্টেপাল্টে দেখলাম যতো রকমে পারা যায়। পাগলের মতো অবস্থা আমার। হেঁশেলের কোণে প'ড়ে থাকা শিলনোড়া, কিংবা উঠোনের একপাশে ফেলে রাখা মুড়ো-ঝাঁটা, আমিতো এই-ই ! নচেৎ একটা পুরানো আমলের সুখপাঠ্য বই, যা খুব যত্ন ক'রে 'আর কোনোদিন পড়া হবে না' এমন এক ভঙ্গিতে ঠেঁসে দেওয়া হয়েছে দেয়ালের নোনাধরা তাকে ; বৃষ্টিতে ভিজে পচার কিংবা অক্ষরগুলো ধুয়ে মুছে যাবার কোনো ভয় নেই ঠিকই, কিন্তু ভাঁজে ভাঁজে আস্তানা গাড়বে কীট, দিনের পর দিন কুরে খেয়ে খাস্তা ঝরঝরে ক'রে দেবে। এভাবে প'ড়ে থাকার চেয়ে ধ্বংস হ'য়ে যাওয়া ঢের ভালো ; গরল ঘুলিয়ে উঠলো আমার ভিতরে। হাঁসফাঁস করতে লাগলাম, এমন একটা সাইক্লোন কি টর্নাডো আসেনা কেন যা বাড়িটাকে গুঁড়িয়ে দেবে, তাক থেকে উড়িয়ে দেবে বইটিকে, প্রতিটি অনুচ্ছেদ খসিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি

ক'রে উড়িয়ে দেবে রাজ্যময়, হাততালি দিয়ে হো হো ক'রে হাসবে। তুমি এলে ঠিক এই সময়—'

বাধা দিয়ে খোকা বললে, 'সিকোয়েন্সগুলো একেবারে সিনেমার মতো!'

'শুধু এলে বললে ছোট্টো ক'রে বলা হবে, তোমার আবির্ভাব হ'লো; আমার জীবনে একটা অসাধারণ অভ্যুদয় ঘটলো। অভ্যুদয় কেন বলছি জানো?'

'নিছক ওজন বাড়াবার জন্যে!' দাঁত দিয়ে কুটুস ক'রে একটা নখ কেটে খোকা উত্তর দিলো।

'তার মানে?'

'ওজন? ওজন এক ধরনের গ্যাস।'

'মানেটা এই, তুমি আমার কথা মোটেই ধরতে পারোনি!'

'না পারার কি আছে এতে—' খোকা বাধা দিয়ে বললে, 'না পারার কি আছে এমন? সোজা কথা তোমরা যেমন দেবা, তেমনি দেবী; আমি তো কোনো ফারাক দেখতে পাইনে। রাজীব ভাই যেমন—গান থেকে গল্প, গল্প থেকে এস্রাজ, এস্রাজ থেকে তুমি, শেষে হীরা-জহরৎ, তুমিও তেমনি! প্রথমে শিলনোড়া, শিলনোড়া থেকে মুড়োঝাঁটা, মুড়োঝাঁটা থেকে সুখপাঠ্য বই, শেষে এক্কেবারে মক্ষিরাণী!'

'আমি বলছিলাম তোমার কথা। তোমার রাজীব ভাই যেমন ভাগ্যকে বদলে দেবার গ্রহরত্ন নিয়ে ঘরে ঢোকে, তেমনি ক'রে নিয়ে এলো তোমাকে। ঝলমল ক'রে উঠলো বাড়িটা। কি বিশ্রী, স্তূপাকার ধুলো আর আবর্জনা ভরা ঘরের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম! সব আবর্জনা দু'হাতে সরিয়ে ফেলতে লাগলাম। তুমি যেন এক অপ্রত্যাশিত দুর্লভ উপহার, এ উপহার যেন আমাকে মানায়, যেন বেমানান না হয় আমার ঘর—'

'তবে যে এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে বললে মাছমারা ছিপ ?' বাধা দিয়ে জিগেশ করলো খোকা।

'জ্বালিও না, কথা বলতে দাও ? তোমাকে দেখে আমি বদলে গেলাম। সাজ সাজ রব প'ড়ে গেল ভিতরে। বাঁচবার জন্যে আমি হাবাগোবার মতো দৈব-দুর্বিপাককে আশ্রয় করতে চেয়েছিলাম ; তার বদলে বিনা চেষ্টায় বিনা প্ররোচনায় তুমি আমাকে উৎসাহিত করলে ভিতরের প্রাণশক্তিকে যাচাই করার। আমি আমার স্বামীর কথা ভাবলাম। এই প্রশ্ন তুলে মনে মনে যাচ্ছেতাই ক্ষেপে উঠলাম, এখনো ওর যা আছে আমার তা থাকবে না কেন। ঠিক প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, প্রশ্নটা একেবারে নিজের অস্তিত্বকে নিয়ে। এখনো কী অগাধ আমার ক্ষমতা, কি প্রচণ্ড আমার শক্তি ! যতোই বুঝতে পারি ততই হাততালি দিয়ে উপচে পড়তে থাকি খুশিতে। ইচ্ছে করলেই আমি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে, ডুবিয়ে দিতে পারি কাদায় ; আমি চাই সানন্দে তুমি আমার ক্রীতদাস হবে। তোমাকে ঘুঙুরের মতো পায়ে বেঁধে রাজ্যময় নেচে বেড়াতে পারি এখনো। ও যেমন বেঁচে আছে, আমিও মরিনি, বেঁচে আছি আমিও। কি নির্লজ্জ সে উল্লাস, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না !'

হীরার মতো জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছিলো নীলভাবী। খোকা হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে নীলাভাবীর দু'চোখ দিয়ে। মাঝখানে দুটি বিন্দুর মতো দু'জনকে বসিয়ে অকারণ আনন্দে চারটি দেয়াল যেন হাত ধরাধরি ক'রে শিশুর মতো নেচে নেচে ঘুরপাক খাচ্ছে ; দেয়ালগুলো এখন জর্জিয়ান। লেসের কাজে মোড়া টিপয়ের ছাউনি দুলছে, দুলছে ফুলদানী, দুলছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রজনীগন্ধাগুচ্ছ, ট্রানজিস্টার যেন বনবিড়াল, খাড়া ক'রে মৃদু মৃদু নাড়ছে এরিয়েললেজ ; হাওয়া, এত হাওয়া আসে কোথা থেকে, সমুদ্রের খুব কাছে তারা, কিংবা একটা জাহাজের ভিতর,

হাওয়ায় মাছের ফিশফিশানি, হাওয়ার গভীর গোপনে সুগোল শূন্যতাবোধ ওজনহীন এক চাঁদের মতো অবিরাম সাঁতার কাটছে।

'এ যাত্রা তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো। আজ আর দু'জনের কাউকে নিয়ে মনের ভিতর কোনো গ্লানি নেই।'

খোকা কোনো কথা তুললো না। ব'সে রইলো নিঃশব্দে।

বিকেল ছোঁয়া নিভন্ত দুপুর, সেগুনবাগিচার প্রাচীন হলদে কোঠাবাড়ির বিড়ালের মতো আলস্যময় কোমল কামরা, এক আঁটি নির্দোষ রজনীগন্ধা, রজনীগন্ধার মতো ধবধবে অঢেল বিছানা, নরোম নিরুদ্বিগ্ন হাওয়া, এবং একটি নারীদেহ,—যা পরিচিত হ'লেই মোমের মমি হ'য়ে যায়, সবকিছু আড়াল ক'রে যাচ্ছে তাকে, আড়াল ক'রে যাচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মতো নিরলস সহজ অভ্যাসে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ভাসা ভাসা মনে হয় খোকার। ঝালরের মতো বিছানার একটা প্রান্ত দুলছে, যেন একটা ভিজে হাওয়ার ঝাপটা, এবং কম্পমান, দুর্বিনীত গ্রীবা তুলে উদ্বেল বিশুদ্ধ রজনীগন্ধাগুচ্ছ থরথর কম্পমান।

ঘুরেফিরে একটা ঝাপসা ছবি, যা দীপ্র পাপবোধের চেয়ে মোহন, তার নিজের দিকে বিবসনা নারীর মতো প্রবলভাবে টানতে লাগলো খোকাকে ; ছবিটি ক্রমশই মায়াবিনীর মতো রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতায় ঃ

স্বপ্নের গভীর সুড়ঙ্গপথ পার হ'য়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলো খোকা ঘরের চারটি দেয়াল তীব্র-মধুর মরণোল্লাসে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ, এক ; পরস্পর বিরোধী অমসৃণ রঙ আর রেখার অনিবার্য অভিঘাতে—এক। কোথাও হলুদ, কোথাও বেগুনী, কোথাও সবুজ, টুকরো টুকরো, গোছা গোছা ; দীর্ঘ অন্বেষণে পরিশ্রান্ত লাল নীল কমলার সন্ধানী রেখার প্রপাত বিপর্যস্ত বিস্রস্ত স্নায়ুর মতোই দেয়ালময় একাকার এবং নিঃশব্দ মৃত্যুর মতো দাঁতাল গহ্বরের প্রতিভাসে

আপতিত উদ্দেশ্যহীনতা আশ্চর্যভাবে পুনসংগঠিত। কোথাও লাল এমন প্রবল তা যেন নিজেরই মাংস নিংড়ানো, কোথাও নীল এমন বিশৃঙ্খল যেন তা আকাশ থেকে করাতে কাটা। একপাশে বৃন্তচ্যুত ফলের মতো বিভিন্ন স্তন, নির্মম নখরাঘাতে যা ছিন্নভিন্নপ্রায়। সন্নিকটে একজোড়া সুগঠিত উরু, যার সন্ধিতে দক্ষ কারুশিল্পীর চিৎকার খোদিত। এই চিৎকার নিসৃত তুমুল রক্তস্রোত যেন নিদারুণ প্রয়োজনেই রহস্য শোভিত অনড় ডলফিনের মতো শিলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে খুবলে খাওয়া শূন্যতার স্তম্ভের আকার নিয়েছে, সেখানে এক অনৈসর্গিক নিস্তব্ধতা আপন পক্ষপুটে অচঞ্চল।

'খোকা তুমি কিছু বলো—'

'কি বলবো—' স্বপ্নের ভিতর থেকে উঁকি দেবার চেষ্টা করলো খোকা ; তার গলার স্বর ঘড়ঘড়ে।

'কিছুই বলার নেই তোমার ?'

দেয়ালের রঙ ততক্ষণে অপসৃত ; চার দেয়ালের সেই অবিশ্বাস্য আলিঙ্গন শৈথিল্যে ভেঙে পড়েছে, স্বপ্নের ভিতরে যেন এই মাত্র একটি কাক ইলেকট্রিক তারে আটকে গিয়েছে, অজস্র চিৎকার এখন কানের চারপাশে।

'আমার নিজের কথা এখনো শেষ হয়নি, ভালো না লাগলে আজ থাক—'

'ভালো লাগছে, তুমি বলতে থাকো—' খোকা চেষ্টা করলো স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেবার, কিন্তু প্রবল বিতৃষ্ণা তার কথাগুলোকে অগোচরে দুমড়ে দিলো।

'যেদিন তুমি বললে, আমার জন্যে তোমার মন কাঁদে, না দেখে থাকতে পারো না, সেদিন দুলে উঠলো আমার ভিতরটা, সে কথা তো আগেই বলেছি। সত্যি বলছি, তোমার ওই স্বীকারোক্তিতে আমার মনের সব বাঁধন একেবারে আলগা হ'য়ে খ'সে পড়েছিলো। একটা

স্রোত এসে ধাক্কা দিচ্ছিলো সেখানে। মনে হচ্ছিলো সেই গোঁয়ার স্রোতের মুখে আমার ঘরবাড়ি বাগান সবকিছু হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়বে, প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেও নিজেকে সামাল দিতে পারবো না। কিন্তু কেন, কেন এমন হ'লো আমার ? বিশ্বাস করবে, আজ থেকে সেই তেরো বছর আগে তোমার রাজীব ভাইও ওই একই কথা বলেছিলো আমাকে, এবং তার যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা-তো বুঝতেই পারছো আমাকে এই সংসারে দেখে !'

'একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—'

'একই কথায় যখন তেরো বছর বাদে ঠিকই একই প্রতিক্রিয়া হ'লো আমার, তখন বুঝলাম আমি মোটেই ওর পিছনে প'ড়ে নেই। সংসার কেন, কোনো কিছুই আমাকে ছোবল দিতে পারেনি। নিজেকে নতুন ক'রে আবার আবিষ্কার করলাম। একটা সোনার প্রদীপ হাত ফস্কে প'ড়ে গিয়েছিলো দীঘির গভীরে, তুমি আমার সেই রাজকুমার ব্যাঙ, তুলে দিয়েছো তুমি ; এখন আর শুধু শুধু ঘর অন্ধকার ক'রে ব'সে থাকা কেন ?'

'শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ বানিয়ে তবে ছাড়লে, একেই বলে সামরিক শাসনের কুফল ! তা থামলে কেন ? আরো কিছু ?'

'আজ এই পর্যন্তই—'

'অর্থাৎ খেল খতম, পয়সা হজম, এই গানের বই গানের বই গানের বই !'

'কিছুটা আছে আরো। এতক্ষণ যা যা বললাম এর সবই তোমার রাজীব ভায়ের জানা। ও সবই বোঝে, সবই আন্দাজ করতে পারে। আর পারবে না-ই-বা কেন, আজ তেরো বছর এক সঙ্গে ঘর করলাম, হাবাকালা তো আর নয় ! তোমার কথা শুনে কি বলেছে জানো ? বলেছে, খোকার ভিতরে নিজের অগোচরে আমার অতীতকে খুঁজে বেড়াচ্ছো তুমি, ওটা আর কিছু নয়,

আজীবন আমাকে ভালবেসে যাবার একটা পাগলামি তোমার ; শুনে আমি হেসেছি।'

'হাসবেই তো, অমন হাসির কথায় না হেসে পারা যায়!'

'চটেছো মনে হচ্ছে ?'

'ছেড়ে দেওয়া গরু যখন পরের ক্ষেতে ধান খাচ্ছে, তখন ক্ষেতটাকে পৈতৃক সম্পত্তি ধ'রে নিতে পারলে আপদ চুকে যায়। এতো বকতে-ও পারো। প্রার্থনা করি নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে ফ্যাঁৎফোঁৎ ক'রে এতক্ষণ যত কথা বললে তার বিন্দু-বিসর্গও যেন আমার বিশ্বাস হয়। মুখ ব্যথা করে না তোমার, এত কপচাও কি ক'রে ? আজ আর আমার ধৈর্য নেই, আমি উঠবো—'

'অত তড়িঘড়ি করার কি আছে, চা খেয়ে তবে উঠবে।'

'গুলি মারো ! চুলোয় যাক তোমার চা ! আমার মাথা দপদপ করছে। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা কোনো একটা সেলুনে যাব, আধঘন্টা ধ'রে শিরমালিশ চালাবো, তারপর অন্য কথা, বাপস্ !'

ঠিক এই সময় হুড়মুড় ক'রে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ঢুকলো রাজীব ভাই ; পা থেকে মাথা ধূলায় ধূসর, দুশ্চিন্তাকাতর মুখাবয়ব। খোকা দেখলো, রাজীব ভায়ের চোখে জটিল চাঞ্চল্য ; মনে হ'লো ভয়ংকর একটা কিছু ঘ'টে গিয়েছে, তাড়া খেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে, ঘরে এসে পোঁছেচে।

খোকাকে দেখে হাতের ব্যাগটা রাখতে রাখতে রাজীব ভাই বললে, 'কতোক্ষণ ?'

'তা অনেকক্ষণ, প্রায় সারাদুপুর—'

'বলো কি !' কথাটা সংক্ষেপে শেষ ক'রে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে নীলা ভাবীর দিকে তাকালো রাজীব ভাই, বললে, 'তোয়ালে সাবান সব দাও, গোশল করবো, গলার ভিতর পর্যন্ত ধূলোবালি কিচকিচ করছে।'

খোকা বিছানা থেকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জিগেশ করলে, 'ব্যাপার কি রাজীব ভাই, এমন হন্তদন্ত হ'য়ে কোত্থেকে ?'

'শহর খুব গরম !'

'তার মানে ?

'বাইরে তুমুল গণ্ডগোল !'

'হঠাৎ !'

'হঠাৎ নয়, আমি তো জানতাম-ই এই ধরনের একটা কিছু হবে। ছটোর সময় প্রেসিডেন্টের কি এক ছাতার স্পীচ ব্রডকাস্ট হয়েছে, ব্যাস্, সারা শহর ফেটে পড়েছে বারুদের মতো। স্টেডিয়ামে চেয়ার ভাঙাভাঙি, দোকানপাট সব দুদ্দাড় ক'রে বন্ধ, রাস্তায় রাস্তায় কেবল মানুষ আর মানুষ। লাঠিসোটা লোহার রড পাইপ, হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে ছেলে বুড়ো জোয়ান সব উন্মত্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছে। সব বন্ধ। গাড়ি-ঘোড়া থেকে হাওয়া-বাতাস, গাছের পাতা পর্যন্ত পড়া বন্ধ। কি বলবো, পথে-ঘাটে হাঁটার উপায় নেই, থৈ থৈ করছে মানুষ। বাবারে বাবা, এতো মানুষ সব ছিলো কোথায় !'

খোকা রসিকতা ক'রে বললে, 'এখন বুঝলেন তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর মালকড়ি কিভাবেই না গুবলেট হয় !'

রাজীব ভাই সহজ গলায় বললে, 'আসলে ওই সব দপ্তরে আমার মতো একজন কনফর্মড বিশেষজ্ঞ দরকার, কি বলো ? সে যাক, তুমি কিন্তু আর মোটেও দেরি কোরো না, এখনই বেরিয়ে পড়ো। গাড়ি-ঘোড়া তো আর নেই, পায়দলই মারতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে খুন-খারাবি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হ'য়ে যেতে পারে, শহরের পরিস্থিতি খুবই খারাপ।'

অনেকক্ষণ পর বাড়ির কথা মনে পড়লো খোকার। ছ্যাঁৎ ক'রে

উঠলো বুকের ভিতর। অতোবড় বাড়িতে পুরুষ বলতে কেউ নেই, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসে সে।

সামান্য একটু এগোলেই রাস্তা। কেবল ধুলো আর ধুলো, চারিদিক ধুলোয় অন্ধকার। অল্পক্ষণের মধ্যেই খোকা মিছিল দেখতে পায়, মহা আক্রোশে ফেটে পড়ছে মিছিলের মানুষ।

ঢল নেমেছে রাস্তায়। মানুষের এমন রুদ্রমূর্তি সে আর কখনো দেখেনি। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে, দিগ্বিদিক ঝাপসা, অবলুপ্ত; চতুর্দিকে বোমার মতো ফেটে পড়ছে শ্লোগান।

এতক্ষণ পর হুঁশ হয় খোকার, বাড়ি থেকে বের হবার পর পরই মিছিলের স্রোত ব'য়ে যেতে দেখেছিলো সে, গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিলো তখনই।

খোকা ছোটা শুরু করে।

প্রতিটি রাজপথই এখন ভয়ানকভাবে পদপিষ্ট। মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষে উপর্যুপরি কেঁপে উঠছে সবকিছু, কাছেপিঠে কোথাও কোনো এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি শতবর্ষ পর রুদ্ররোষে উদ্‌গিরিত হচ্ছে, ভস্মাচ্ছাদনে মুড়ে দিয়েছে চিৎপাত শহরকে; সংহারপিপাসু উত্তুঙ্গ অগ্নিময় লাভাস্রোত ধীর অথচ অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসরমান।

মানুষের ভিড় কেটে বেরুতে পারছে না খোকা। বার বার ধাক্কা খাচ্ছে। আসন্ন ত্রাস তাড়া করছে তাকে; মুহূর্তের সামান্য ব্যবধানে একটা আবশ্যিক প্রতিক্রিয়ায় সবকিছু হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়বে, ভেঙে পড়বে বিচারালয়, ভেঙে পড়বে মিলনায়তন, ভেঙে পড়বে পানশালা, স্টেডিয়াম। এতদিন তার চোখে যা ছিলো সামান্য মানুষ, এখন তা সংগঠিত অবিচ্ছিন্ন মিছিলে। খোকা শিউরে উঠলো, এতদিন তার কাছে যা ছিলো দয়িতা যামিনী মদিরার মতো তিন অক্ষরের হালকা পালকে মোড়া পাখির মতো নিছক একটি রোগা শব্দ, এখন তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়েছে শহরময়, জনতা!

পিঠোপিঠি কয়েকটা দিন এইভাবে কাটলো। ঘর থেকে বের হয়নি খোকা। সম্বল বলতে কেবলমাত্র খবরের কাগজ, অথচ এ জিনিশটা দু'চোখে দেখতে পারে না সে, দারুণ বিতৃষ্ণা। সাধারণত সে কাগজ পড়ে না, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তাকে পড়তে হচ্ছে।

এ কয়দিনের ভিতর সবকিছু বেজায় রকমের বদলে গিয়েছে। কাগজ হাতে নিলে মনে হয় সদ্য অস্ত্র কারখানা থেকে বারুদ মেখে এসেছে। ছিটেফোটা দুর্ঘটনার খবর আসছে যখন-তখন। পরস্পর বিরোধী রাজ্যির যত উড়ো খবরে বাজার সরগরম। কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু অচল ; দিনরাত ঘোঁট পাকাচ্ছে মানুষজন।

মোড়ে মোড়ে জটলা, প্রায় সর্বক্ষণ প্রতিটি রাস্তাতেই বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিটি ময়দানেই জনসভা। সর্বত্র একই কানাকানি, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার উদ্দেশ্য কি, না-কি আসলে সবটাই আগাগোড়া একটা ধাপ্পা ; আবার সেই বুটজুতো আর রাইফেলের বাঁটের গুতো !

ক্ষেপে উঠেছে মানুষজন ; একটু স্বতন্ত্র এবারের এই ক্ষ্যাপামির চরিত্র। আয়ত্তের বাইরেও চ'লে যাচ্ছে কোথাও কোথাও। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হবে এবার, এইসবে বিশ্বাসী অতি সাধারণ মানুষও। অবাঙ্গালী পুঁজিপতিরা বস্তা বস্তা টাকা পাচার ক'রে ফেলছে, রুই কাতলারা ভাগছে, গা ঢাকা দিয়েছে অনেকেই, একটা কালো পরিণতি ধীরে ধীরে তার ক্ষেত্র তৈরী করছে।

সাত-সকালে ময়নার বাবা এসে এক ঝঞ্ঝাট বাধালো। সে ড্রাম ফ্যাক্টরীর শ্রমিক, রায়পুরের লোক। এখন আর ঢাকা শহর নাকি মোটেই নিরাপদ নয়, ময়নাকে গ্রামের বাড়িতে রেখে আসতে চায়।

খোকা বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'আমাদের ফেলে বাছাই ক'রে তোমার মেয়েকে কেউ মারতে আসবে না।'

লোকটা নাছোরবান্দা ধরনের। বললে, 'আপনাদের আবার কিসের ভয় ? আপনাদের কেউ মারতে আসবে না। চিরকাল যত গজব সব আমাদের মতো ফুটোকপালে গরিব-দুঃখীদের ওপরই ; গায়েও আঁচড় লাগবে না আপনাদের—'

খোকা পষ্টাপষ্টি বলেই ফেললে শেষ পর্যন্ত, 'ও চ'লে গেলে অসুবিধে হবে আমাদের !'

ময়নার বাবা বললে, 'লোকে যা বলাবলি করছে তাতে শহরে থাকা চলে না পারলে কিছুদিনের জন্যে আপনারাও একদিকে চ'লে যান। আল্লা করুক, জয়বাংলা যদি হ'য়েই যায় তাহলে আর মেয়েটাকে ঝিগিরি করায় কে !'

খোকার মেজাজ খিচড়ে উঠলো এইসব কথায়। বুঝলো কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না, খামোখা, পাগল ক্ষেপেছে ; ময়নার বাবার এমন একরোখা চেহারা এর আগে আর কখনো চোখে পড়েনি তার। ভিতরে ভিতরে একটা কিছু ওকে নাড়া দিচ্ছে. খোকা বুঝতে পারে, ফলে বিশ্বাসে যত না জ্বলজ্বলে তার চেয়ে বেশি উদ্ধত এখন লোকটা, ঘাঁটাঘাটি না করাই ভালো।

'কি রে ময়না যাবি নাকি ?' ভিতরে গিয়ে সে জিগেশ করলো ময়নাকে। বললে, 'যাবি তো যা, সৎ মায়ের কাছে আগের মতো আরামেই থাকবি !'

ময়না বললে, 'আগেই ব'লে দিয়েছি, যাব না আমি—'

'তোর মর্জি !'

ময়না বললে, 'আমার জন্যে অত ভাবতে হবে না, ব'লে দিন।'

'তাহলে যা, বিদায় ক'রে আয়—'

ময়নাকে গররাজি দেখে গালাগাল শুরু করলো লোকটা। বললে, 'বেয়াদব মেয়ে কোথাকার ? চুল ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে বার করবো এখান থেকে। বড়লোকের বাড়িতে ফ্যানের বাতাস খেয়ে

খেয়ে মুটিয়ে যাওয়া দেখাচ্ছি তোকে, এইবেলা গোছগাছ ক'রে নে, নইলে মেরে তক্তা বানাবো ?'

'মেয়ে নিয়ে যেতে এসেছো, মেয়ে নিয়ে যাবে ; বাজে কথা বললে অসুবিধেয় পড়বে বলে দিলাম—' খোকা তেড়ে উঠলো।

'আমি আমার মেয়েকে বলছি, আপনি গায়ে মাখছেন কেন ?' ঘোঁত ঘোঁত ক'রে উঠলো লোকটা, 'ওটা একটা কুত্তি, কুত্তিটাকে এইবার চেন দিয়ে বাঁধবো, ওর রস মেরে গুড় করবো—'

ফোঁশ ফোঁশ ক'রে কান্না শুরু করে ময়না।

শেষ পর্যন্ত দু'দিন পরে তার যাওয়া সাব্যস্ত হ'লো।

রঞ্জু মুখ কালো ক'রে বললে, 'এখন উপায় ?'

'সেল্‌ফ-হেল্‌প !'

'নিজে তো ব'লেই খালাস !'

'কেন; ঠিকে ঝি আর লেবুকে দিয়ে চলবে না ?'

'ঠিকে ঝি তো ক'দিন থেকে ঝক্কি শুরু করেছে, ও নাকি আর কাজ করবে না, দেশে যাবে। এতদিন আমরা ফাঁকি দিয়ে ইচ্ছেমতো ঠকিয়েছি ওদের, মানুষ ব'লে গ্রাহ্যই করিনি, কাজে এলেই প্যান প্যান ক'রে এইসব তোলে—'

'এক কাজ করা যাক বরং—' খোকা হাসতে হাসতে বললে, 'আয় দু'জনে মিলে আমাদের আগা মোহাম্মদের কাছে একটা জয়েন্ট পিটিশান করি, কামের লোকের খুব অভাব, তোমার ওই দস্তানাগ গাওয়া কিছু বুগতি-টুগতি এদেশে পাঠাও।'

কিছুটা আনমনা হ'য়ে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে রঞ্জু বললে, 'কি সব অলক্ষুণে কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছে বলতো, একরত্তিও ভাল লাগছে না আমার !'

'তোদের কলেজের মেয়েরা পাকাঠির গোছা হাতে নিয়ে সমানে রাস্তায় রাস্তায় ডান-বাম ডান-বাম ক'রে বেড়াচ্ছে, খবর রাখিস ?'

'দুর, আমার ও'সব ভালো লাগে না !'

কলেজে যে ফাটাফাটি চলছে রঞ্জু তা জানে। কলেজে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে সে ; ক্লাস হয়না, স্রেফ মিটিং আর মিছিল।

'যা না, ঘুরে আয়, নিদেন পক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোকরা তো দেখা হবে—'

রঞ্জু বললে, 'এই একটু আগেই তো পাড়ার কয়েকজন ডাকতে এসেছিলো। ওরা হেঁটে-কলেজে গেল বহু মেয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে!'

'তোদের আবার ট্রেনিং লাগে নাকি! তোরা তো পেটে থাকতেই হাফেজ ব'নে যাস!'

রঞ্জু বললে, 'রাইফেল ট্রেনিং রাইফেল ট্রেনিং!'

'কচু হবে ওতে, শালার এটা একটা ফ্যাশন; যা নড়ুয়ে তোমরা এক একখান, এহ্!'

রঞ্জু খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসলো। বললে, 'শেষ পর্যন্ত কি হবে বলতো?'

'কি আবার হবে, হয় দু'পাঁচশো লোক মেরে সব ঠাণ্ডা ক'রে দেবে না হয়—'

বাধা দিয়ে রঞ্জু অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'সব মেনে নিলেই তো পারে, শুধু শুধু হই হই রক্তারক্তি ক'রে লাভটা কি?'

'তুই বরং ঘচাং ক'রে একটা খত ঝেড়ে দে, কাজ হ'লেও হ'তে পারে, লোকটা নাকি মেয়েলোকের কথায় ওঠে-বসে।'

'ঠাট্টা রাখ, একটু বুঝিয়ে বল্না ছাই! আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারার সময় তো মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ছোটে।'

রঞ্জুর বিনুনি ধ'রে একটা টান মেরে খোকা বললে, 'তুই যা বুঝিস অন্তত সেটুকুও যদি ওদের মগজে ঢুকতো তাহলে তো আর কোনো ল্যাঠাই ছিলো না।'

'আচ্ছা ধর, শেষ পর্যন্ত যদি কোনোরকম মিমাংসা না হয়?'

'হবে কে বললে?'

'ধর হ'লো না, তখন ?'

'কেন প্লেন বোঝাই বোরখা পরা সৈন্য নামছে রোজ এয়ারপোর্টে শুনিস নি ?'

'বাপি যে কেন আগেই চ'লে আসছে না !'

'রাওয়ালপিণ্ডির পিণ্ডি চটকাবে কে, তুই ?'

'যা-ই বলিস, চাকরি জিনিশটা এত্তো বাজে—'

'এ্যাঁ, পথে এসো বাবা, পথে এসো। সেই জন্যেই তো বেকার ব'সে আছি।'

'তুই একটা কুড়ের ডিম, চাকরি কেন, তোকে দিয়ে কিছুই হবে না কখনো।'

লম্বা হাই তুলে পটাপট দু'টো আঙ্গুল মটকে খোকা আউ আউ ক'রে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'বেশ আছি শালার, কি বল ? আহারে, চিরটা কাল যদি এইভাবে আরামসে পিপুফিশু ক'রে কেটে যেতো !'

'শরীরে ঘুণ ধরতো, উঁইপোকা ধরতো—'

'শরীরে উঁইপোকা না ধরলে কি আর মুনি-ঋষি হওয়া যায় রে, তুই একটা ইস্টুপিট, ষাঁড়ের গোবর, গোমুখ্যু !'

একটু পরেই জয়বাংলা ব'লে মুরাদ ঘরে ঢুকলো।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একগ্লাস পানি চেয়ে খেলো সে। বললে, 'ক'দিন থেকে হাঁটতে হাঁটতে শালার পায়ে ফোস্কা প'ড়ে গিয়েছে।'

'বলিস কি, ফোস্কা আবার কি ; তোর পা জোড়াই তো ফোস্কা।'

'তার মানে ?'

'একে বেকার, তায় শালা আবার মাঝে মাঝে কবিতে সংকলন বের করার ঘোড়ারোগ আছে, তোর পা আবার কবে পা ছিলো শুনি ?'

একটু লাগলো মুরাদের এই কথাটা। খোকার মতোই সে বেকার। তফাতটা শুধু এই, গোটা দুয়েক মাস্টারি করে সে, আর চাকরির চেষ্টা তদবিরের জন্যে ঢালাও সুপারিশ মামা ঢুঁড়ে বেড়ায়।

মুরাদ আলগোছে বললে, 'বাপের টাকা থাকলে তো ধ্বংস করবো। সে যাক, কি করিস কোথায় থাকিস, প্রায় সারাদিনই আজ-কাল রেক্সে আড্ডা চলে, একদিনও পাওয়া যায় না তোকে, না কি সব ছেড়ে-ছুড়ে একেবারে যোগী হ'য়ে গেলি!'

'ধরেছিস ঠিকই।'

'আমি তো ভাবলাম নির্ঘাৎ অসুখ-বিসুখ একটা কিছু বাধিয়ে ব'সে আছিস, তা' না হ'লে এই সময় কোনো পাগলেও ঘরে ব'সে থাকে ব'লে আমার মনে হয় না। এই তো সময় চুটিয়ে আড্ডা মারার। গরম বাজার, অফুরন্ত সময়, স্রেফ চা মারো আর গুলতানি।'

'ব্যাস্, তাতেই দেশ স্বাধীন?'

'আলবৎ তাই! স্রেফ চায়ের কাপে চুমুক মেরে আর গুলতানি ঝেড়ে স্বাধীনতা নিয়ে আসবো এবার, দেখে নিস। এবারে শালার স্বাধীনতা রোখে কে?'

'খাতায় নাম লিখিয়েছিস নাকি, যে টোনে কথা বলছিস?'

'ওসব বুঝি না—' মুরাদ চঞ্চল হ'য়ে বললে, 'এখানে-ওখানে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়তে দেখা যাচ্ছে, এখন পিছনে ফেরার আর কোনো পথ নেই চাঁদ।'

'সর্বনাশ! তুই-ও কি ট্রেনিং নিচ্ছিস?'

'ট্রেনিং? ট্রেনিং আবার কি। নে নে খচড়ামি রেখে চা-টা খাওয়াবি তো খাওয়া।'

'যথাসময়েই চা আসবে।' অপেক্ষাকৃত বিমর্ষ মুখে খোকা বললে, 'সত্যি ক'রে বলতো, এইসব হৈহল্লা দা-কুড়ুল-লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পাঁয়তারা, এখানে ওখানে লুটতরাজ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এসব ভালো লাগছে তোর?'

মুরাদের চোখ-মুখ চকচক ক'রে ওঠে সহসা।

বললে, 'এটা ঠিক ব্যক্তিগত ভালো লাগালাগির ব্যাপার নয়, তুই

ছোট ক'রে দেখছিস ব'লে তোর কাছে অমন মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা সারা দেশকে নিয়ে, একটা গোটা জাতিকে নিয়ে। ঘরের কোণায় ব'সে তুই কি ভাবলি, কিংবা রেক্সের আড্ডায় ব'সে নিছক ভাবাবেগের খাতিরে আমি কি বললাম, এইসবে কিছু যাবে আসবে না। তাকিয়ে দেখ সারা দেশটার দিকে; একটা ক্রুদ্ধ বাঘ, থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে তার গর্জন। যে কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর একটা কিছু ঘ'টে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আজ তো শুনলাম কুমিরার কাছাকাছি দু'হাজার সৈন্য এসে পৌঁছেচে, যে কোনো মুহূর্তে তারা নেমে পড়বে—'

'তার মানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের দিকেই মোড় নিচ্ছে সবকিছু, এই তো বলতে চাস?'

'আমার তো তাই মনে হয়। এই শালার রাসপুটিনের চেহারা মার্কা বিদেশী সাংবাদিকদের ভিড় দেখলেই আমার হৃদকম্প শুরু হ'য়ে যায়; একটা সাংঘাতিক কিছুর আঁচ করতে না পারলে ব্যাটারা এমনভাবে চাক বাঁধতো না ঢাকা শহরে। টিক্কা খানকে পাঠানোর ব্যাপারটাও যে নিছক একটা ব্লাফ আমি তা মনে করি না। পুরোদমে একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, দেখা যাক কি হয় আগামীকাল!'

'রেসকোর্সের মিটিঙের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ। সবাই কানাঘুষো করছে কালকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। বেশ লাগছে যা-ই বলিস। জীবনে এই রকমেরই উত্তেজনা চাই! স্বাধীনতা-টাধিনতা বুঝি না, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি দেশটা একটা বৈপ্লবিক পরিণতির দিকে লেজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে।'

'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিস তুই?'

'পরিষ্কার—'

'ধর বেধড়ক মার দিয়ে যদি সব কিছু আবার ঠাণ্ডা ক'রে দেয়, তখন?'

একটু ভেবে নিয়ে মুরাদ বললে, 'এখন যে পরিস্থিতি তাতে সেটাই স্বাভাবিক। যতই ট্রেনিং নিক, কুচকাওয়াজ করুক, দেশের লোকের হাতে আছেটা কি? বাঁশের লাঠি আর পায়খানা ঘরের ঝাড়ু, ব্যাস্! এই কিছু না থাকাটাই মারমুখি হ'তে প্রলুব্ধ করবে সামরিক শক্তিকে, আর সত্যি কথা বলতে কি এই মারটাই আমাদের ভয়ংকর রকম দরকার। চিন্তা ক'রে দেখ, সামুদ্রিক বান আর ঝড়-ঝাপটায় যেখানে এক কথায় ঝট ক'রে পনেরো-বিশ লাখ লোক গরু-ছাগলের মতো বেঘোরে মারা পড়ে সেখানে দেশের কোনো পরিবর্তনের খাতিরে দু'দশ হাজার লোকের আত্মাহুতি তেমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। মোদ্দা কথা, ওরা যদি এখন সামরিক শক্তি প্রয়োগের দিকটাই বড় ক'রে দেখে থাকে তাহলে বিপ্লবের জন্যে এটাই হবে সোনায় সোহাগা; তখন কোন্ শালা আর ঠেকিয়ে রাখে বিপ্লব। খ্যাংরাকাঠি আর মচকানো বংশদণ্ড ফেলে ঠিক তখনই হবে সশস্ত্র সংঘর্ষ। চে গুয়েভারার মতো ধ'রে নিতে পারিস বিপ্লবের জন্যে তখন আর মাথা কুটে মরতে হবে না আমাদের, বিপ্লব নিজেই কলকাঠি নেড়ে দুদ্দাড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবে মানুষকে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ হবে সব কথার শেষ কথা, মানে নির্লজ্জ শেষ চেষ্টা, মরণ কামড়। সেটা যদি কোনোক্রমে একটু চিড় খায়, তাহলে ব্যাস্, তোর ওই খেল খতম, পয়সা হজম, গানের বই গানের বই গানের বই—'

খোকা দাঁত দিয়ে বুড়ো আঙুলের নখ কাটতে লাগলো কুট কুট ক'রে। অসম্ভব দুশ্চিন্তাকাতর মনে হয় তাকে। অকূল পাথারে ভাসছে, থৈ পাচ্ছে না।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মুরাদ বললে, 'এই চান্সে আমি কি করেছি জানিস, আড়াইখানা কবিতার পত্রিকায় হাত দিয়েছি। এইবার সব লীশা হিজড়েগুলোর পিলে ফাটিয়ে দেব। যা একখানা মাল ছাড়বো না, দেখে নিস! একটা তো বেরিয়েই গেছে—'

'লীশা কি রে?'

'শালী থেকে লী, শালা থেকে শা, বুঝলে চাঁদ ?'

'তুই এখনো সেই আগের মতো ঈশ্বর অন্ধকার চিৎকার কবোষ্ণ-টবোষ্ণ চালাচ্ছিস নাকি ?'

'তোর শালা সেই পাঁচ বছর আগেকার কথা তুলে খোঁচা দেওয়াটা একটা রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ! নিজে শালা এ পর্যন্ত কি এমন হাতি-ঘোড়া বাঘ-ভাল্লুক মেরেছিস শুনি ?'

মুরাদকে চ'টে উঠতে দেখে খোকা হেসে ফেললো ।

বললে, 'অমন দাঁতমুখ সিটকে হাত-পা ছুড়িস না, তোকে উল্লুকের মতো দেখায় ! আমার তো বারোটা বেজেই গেছে, এ আর নতুন কথা কি—'

মুরাদ বললে, 'বাজে কথা রাখ, রেসকোর্সে যাচ্ছিস তো কাল ?'

'কালকের কথা কাল হবে, তুই কি এখন উঠছিস ?'

'যেতে হবে না ?' চোখ নাচিয়ে মুরাদ বললে, 'তোর কি, তুই শালা দিনের পর দিন ঢালাও বিছানায় বুদ্ধের শয়ান হ'য়ে থাকবি, আর পায়দল মেরে মেরে অন্যেরা তোর চেহারা মুবারক দেখে যাবে, আছিস বেশ ! যাচ্ছিস তো ? প্রত্যেকটা দিন এখন ইতিহাসের এক একটি পাতা ; আমরা এক একজন এক একটা সাক্ষী হ'য়ে থাকবো । চ'লে আয় রেক্সে, এক সঙ্গে দল বেঁধে বের হওয়া যাবে ।'

'চেষ্টা ক'রে দেখবো ।'

'দিন দিন তুই শালার একটা কুনোব্যাঙ ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে যাচ্ছিস !'

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো মুরাদ, তারপর কিছু একটা ভেবে নিয়ে বললে, 'দোহাই তোর, কালকে আয়—'

খোকাকে খুব অসহায় মনে হয় এই সময় । ভিতরে ভিতরে একটা কিছু ছুরির মতো কাটছে তাকে, সুস্থির হ'তে পারছে না

কিছুতেই ; হাতের মুঠোয় এমন একটা কিছু চায় খুব ধারেকাছে যা নেই, কিংবা কোনোদিন আর তা পাওয়া যাবে না।

জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। রাস্তায় মিছিল ; শ্লোগান ফেটে পড়ছে, রক্ত চাই রক্ত চাই! দুপুরের ঝিলমিলে রোদ, বাতাস এবং যাবতীয় নিঃশব্দ চারুময়তা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। জ্বরাক্রান্ত সময়ের গা থেকে ভাপ উঠছে, ঝাঁঝালো তাতানো একটা দস্যুর মতো আকাশ রোষ কষায়িত নেত্রে অপলক চেয়ে আছে, যে কোনো মুহূর্তে ছুড়ে মারবে ঝনঝনে থালা, খোকা তার নিজের ভিতরে একটা অদ্ভুত ধরনের ভাঙন অনুভব করে।

'আসাদের কথা তোর মনে আছে মুরাদ ?'

দূরাগত ধ্বনির মতো মুরাদের কানে বাজলো কথাটা। বেরুতে গিয়ে সে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, 'মনে থাকবে না কেন, সেই যে—

আপদ বালাই উল্টো হাঁটে
দুরমুশ খাঁ ঠোঁকে জুতো,
আসাদ শুধু ম্যাজিক দেখায়—
ফুশ-মন্তর দেখ্‌লি তো ?'

খোকা বললে, 'আমি ভাবতেই পারিনা আসাদ নেই। খুব কষ্ট হয় আমার। এই যে ও নেই, তার জন্যে কার কি এমন ক্ষতি হয়েছে, কি এমন যাচ্ছে আসছে ? নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই—এসব একেবারেই বানোয়াট কথা, কানে খুব ভালো শোনায়, এইটুকুই। অন্যকে মরতে উৎসাহিত করাটা পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে সহজ একটা কাজ। মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান, শ্যাম সমানই যদি হবে তবে নাভিশ্বাস ওঠার পর কবরেজ-বদ্যি করার কি দরকারটা এমন ? নিছক একটা ধাপ্পা, একটা জঘন্য প্রচারণা, বাবু বিলাসিতা—'

মুরাদ বললে, 'অনেক সময় আসাদের জন্যে আমার নিজেরও নানান কথা মনে হয়; কষ্ট দেয় ওর স্মৃতি। অন্যদের চেয়ে আমাদের কষ্টটা বোধহয় একটু বেশিই। কিন্তু কেন জানিস? ও আমাদের খুব কাছের একজন ছিলো ব'লে, চিনতাম ব'লে, জানতাম ব'লে। আসাদ ছিলো আমাদের কাছে বাতাসের ঝাপটার মতো হঠাৎ দেখা পাওয়া বন্ধু; এই জন্যেই কষ্টটা। অত্যন্ত ব্যক্তিগত এ কষ্ট। যারা তাকে চিনতো না বা যাদের সঙ্গে তার কখনো পরিচয় ছিলো না, তাদের কাছ থেকেও কি তুই এটা আশা করিস? যদি করিস, তাহলে সেটা নিছক পাগলের পাগলামি। চোখটা নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে দেশ ও দশের স্বার্থের মাপকাঠিতে ফেলার চেষ্টা কর, দেখবি আজ আর এটা নিছক একটা নাম নয়, ঝকঝকে সোনার তলোয়ারের একটা প্রতীক, বিশাল দেশের ওপর স্থির বিদ্যুতের মতো যা ঝুলে রয়েছে। এভাবে দেখতে পারলেই বুঝবি তোর ওই বন্ধুর জন্যে শোক হা-হুতাশ তরতর ক'রে একেবারে পানসে হ'য়ে গিয়েছে। দেশের কষ্টিপাথরে যদি এভাবে সবকিছু ঘ'ষে নেবার চেষ্টা করিস তাহলে দেখবি আমাদের এইসব ব্যক্তিগত শোক আর কিছু নয়, এক ধরনের গোপন সুখ, আর সুখ ব'লেই দিনের পর দিন এমনভাবে তা বুকের ভিতর লালন ক'রে চলি। কিংবা ধর ঠিক তা-ও নয়; ওটা একটা শোকই। শোক হলেও ফ্লু কিংবা চোখ ওঠার চেয়ে, কিংবা টনসিলের ব্যামোর চেয়ে তেমন কোনো মারাত্মক কিছু নয়।'

'ডাকাতের মতো কথা বলছিস! অনেক বদলে গেছিস ক'দিনে, জঘন্য!'

'আমি ব'লে দিলাম, তুই দেখে নিস, তোর কপালে ঢের বিপদ আছে খোকা! তুই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিখিসনি। দেশ হয়তো ক্ষমা করে, কিন্তু সময়, ভ্যাট্!'

'দেশ দেশ ক'রে চাষার মতো অমন চিৎকার জুড়েছিস কেন? দেশ বলতে কি বুঝিস তুই? একটা আধপাতা বয়সের ছোকরা, কতোটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে তোর? কবিতা লেখার নামে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করছিস পাঁচ বছর; যখন দেখছিস কিচ্ছু হচ্ছে না তখন ষাঁড়ের মতো গায়ের জোর ফলিয়ে বলছিস এক্সপেরিমেন্টাল। ডিপার্টমেন্টাল হেডদের মোট ব'য়ে ব'য়ে নাড়ু-বাবুটি সেজে কোনো রকমে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিস, কিন্তু ভাগ্যে চাকরি জোটেনি। নিজের বেকারত্ব নিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে এখন হঠাৎ দেশ দেশ ক'রে পাগলা হ'য়ে উঠেছিস, আমাদের ময়নার বাপ যেমন ভাবে জয়বাংলা কায়েম হ'লেই আর কাজ করতে হবে না তার মেয়েকে! এটা আর কিছু নয়, ক্লাস পাবার জন্যে হেডস্যারদের ঝাঁকামুটে সাজা যেমন, বিজ্ঞাপনের টাকা মারার জন্যে সংকলন বের করা যেমন, ঠিক তেমনি একটা কিছু! দেশের তুই কি বুঝিস?'

মুরাদ ফিরে এসে বসলো। বসার সময় হাতের বইগুলো ডিভানের উপর ছুড়ে দিলো; বই ছুড়ে ডিভানটাকে সজোরে মারলো সে। তারপর আচমকা সেন্টার টেবিলে ডুম ক'রে প্রচণ্ড কিল বসিয়ে বললে, 'তুই একটা ইতর, জঘন্য তোর মন! কিসের জোরে কোন অধিকারে এত সহজে তুই এসব কথা বলতে পারিস?'

'ষাঁড়ের মতো চিৎকার করবি না। এটা রেক্স নয়, ভদ্রলোকের বাড়ি!'

'আমি চিৎকার করছি, না চিৎকার করছিস তুই? তুই একটা বদ্ধোন্মাদ!'

'দাদা!'

দরোজার ভারী পর্দার গা ধ'রে রঞ্জু এসে দাঁড়িয়েছে, খোকা দেখতে পেল। বললে, 'ও কিছু না, তুই ভিতরে যা—'

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সে আবার আগের জায়গাতেই এসে

বসলো। বললে, 'তোর সম্পর্কে কতগুলো বাজেকথা উচ্চারণ করতে হয়েছে, এজন্যে দুঃখিত। কিন্তু যা সত্যি তা বলতে আমি কারো চোখ রাঙানোর পরোয়া করি না। অধিকার আবার কিসের, সাহস লাগে নাকি এতে ?'

মুরাদ ততক্ষণে বন্য পশুর মতো হিংস্র উত্তেজনাকে ঝেড়ে ফেলে অনেকটা সংযত হ'য়ে এসেছে। সে কতকটা সহজ হওয়ার অভিপ্রায়েই আহতকণ্ঠে বললে, 'আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খোকা বললে, 'কিন্তু দরকার হ'লে মারামারি-ও তুই করতে পারিস !'

'তোর আত্মম্ভরিতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দিন দিন। তুই কি ভাবছিস না ভাবছিস তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি শুধু গোটা সমস্যাকে দু'জনের মধ্যেকার ব্যক্তিগত ব্যাপার হিশেবে দেখতে চাইনি, যেটা তুই চাস। কথা হচ্ছিলো দেশ নিয়ে; তার ধারকাছ দিয়ে না গিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু ক'রে দিলি তুই। নিছক মাতলামি ছাড়া আর কি বলবো একে ! দেশ বলতে তোদের ধানমণ্ডির এই বাড়ি নয়, যা ঘুষের পয়সায় তোর বাবা তৈরি করেছে। দেশ মানে খান সাহেবদের দালালি নয়। দেশ মানে ভক্ত কুকুরের মতো প্রভুদের পা চাটা নয়। এই যে হারামির পয়সায় থরে থরে সাজানো তোর ঘর, চারপাশের রাশি রাশি বই, আলস্য আরাম ঘুম, দেশের চেহারাটা ঠিক এর উল্টোটাই !'

খোকা মরিয়া হ'য়ে বললে, 'তুই তাহলে নিশ্চয়ই একথা বোঝাতে চাচ্ছিস আমাকে, দেশ মানে তোর বাবার রেশন শপের যাবতীয় সেদ্ধ চাল বাজারে ব্ল্যাক ক'রে গম আর আতপ চাল গেলানো। দেশ মানে তোর ম্যাট্রিক ফেল চোগা-চাপকান চাপানো বড় ভায়ের ফোরকানি কেতাব চড়াদামে বি· এন· আর-এর কাছে গচানো। দেশ মানে তোর

বড়বোনের জীবন বীমার দালালি করা, ব্ল্যাকডগ গিলে চুর হ’য়ে লাল নীল সাদা কালো টয়োটা-ইম্পালায় মাঝরাতে ঘরে ফেরা। ঠিক আছে। আমি মেনে নিচ্ছি। এবং এই সঙ্গে এও মেনে নিচ্ছি এই দেশটা একা তোর, আমি কেউ নই, হ’তে পারিনা এই দেশের। দেশ বলতে যদি এই সবই হয় তাহলে দেশদ্রোহী হ’তেও রাজি আছি আমি।’

‘এগুলো কোনো তর্কই নয়, নোংরা কাদা মাখামাখি। এর কোনো মানে হয় না—’ অপেক্ষাকৃত ঝিমিয়ে পড়ে মুরাদ, নিষ্প্রভ হ’য়ে আসে।

‘কেন তোর বোনের প্রসঙ্গ উঠেছে ব’লে?’

‘তোর যা খুশি বলে যা, এসব যখন তোর ভালো লাগছে। আমি বাধা দেবার কে?’

‘কেন ড্যাফোডিলে ব’সে বিয়ার গিলতে গিলতে হাউ হাউ ক’রে আমার কাছে এসব কাঁদুনি গাইবার সময় তো খারাপ লাগেনি! নাকি বেহেড মাতাল হ’য়ে পড়েছিলি সেদিন?’

‘বাজে কথা রাখ!’ সিগ্রেট ধরিয়ে হঠাৎ সোজা হ’য়ে বসলো মুরাদ, তেমন কিছুই ঘটেনি এই রকমের একটা ভঙ্গি ক’রে সে বললে, ‘দেশ বলতে আমি কি বুঝি তাই জানতে চাস তুই, বলছি শোন! কখনো বন-উপবন খাল-বিল নদ-নদী পশু-পাখি ঝড়-বৃষ্টি-রোদ-মানুষ রাজ্যের যাবতীয় জিনিস নিয়ে যে ভৌগোলিক সীমা, তাই হ’লো দেশ। এক্ষেত্রে পদ্মার একটা ইলিশ কিংবা মাঠের একটা ঘাসফড়িং সুন্দরবনের একটা চিতল হরিণ কিংবা মানিকছড়ি পাতাছড়ি হিমছড়ির মোটা মোটা শিশিরবিন্দু কোনো কিছুরই বাদ পড়ার সম্ভাবনা নেই। কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। এমন কি স্মৃতি, অর্থাৎ অতীতে এই সীমার আওতায় যা ছিলো তা-ও কখনো মহাস্থানগড় হ’য়ে কখনো শালবন বিহার হ’য়ে দেশ শব্দটির মধ্যে গ্রথিত হয়ে যায়।’

'থামলি কেন, চালা—' পা লম্বা ক'রে দিলো খোকা।

কিছুক্ষণের জন্যে থেমে, সিগ্রেটে লম্বা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া উদ্গীরণ ক'রে কুণ্ডলীর ভিতর থেকে গলা তুলে, আমি তোমাকে বধ করতে চাই না আমি তোমাকে বাধ্য করবো শুনতে—এই রকম একটা ভঙ্গিতে পুনরায় শুরু করে মুরাদ, 'আবার কখনো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সমষ্টিবদ্ধ মানুষ মিলেমিশে এমনভাবে পৃথিবীর একটি পৃষ্ঠদেশ তৈরি করে যে দেশ শব্দটির রোমান্টিকতা পদপিষ্ঠ হবার ভয়ে সমষ্টির ওই লৌহবন্ধনীর ভিতর ঢুকে প'ড়ে ইচ্ছেমতো হারিয়ে যায়। আর তখন, এমন একটা মূর্তিমান অবস্থার দরুণ পদ্মার ইলিশ, ইস্টিমার, পুরানো পল্টনের বুড়ো অশথ গাছ, আলস্য কুঞ্জ, মায়াবন, সবকিছু ঝাপসা হ'য়ে যায়। শারদ আকাশ, বিনম্র কুঞ্জলতা, দীঘির পাড়ের বিলোল বিকেল, কালো কুচকুচে নৌকোর মতো বেদেনীর তীক্ষ্ণ শরীর, কিছুই আর মনে থাকে না তখন। অথচ এইসব যে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায় তা-ও নয়—'

খোকা নীরবে শুনছিলো। তার ঘাড়গোঁজা মূর্তি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো মুরাদ খাঁচায় পুরে খোঁচা দিলেও টু শব্দটি করবে না সে এখন। খোকার এই ধরনের নাটুকেপনাময় মতিগতির সঙ্গে তার অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে।

'পদপিষ্ঠ হবার ভয়ে' কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো খোকা। নিছক খুশি করার জন্যে বলা, না কি অগোচরে ঠোঁট গ'লে টুপ ক'রে ঝ'রে পড়েছে! হয়তো ঘোলাটে পরিস্থিতির পাগলা ঘোড়ার ঘাড় অন্যদিকে ফেরাবার লাগাম হিশেবেই অঙ্ক কষে ব্যবহার করলো মুরাদ কথাটা। কিন্তু এত প্যাঁচের ভিতর যাবার কথা নয় মুরাদের, সৎসাহস আছে ওর খোকা জানে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে লতা-গুল্ম ফল-ফুল জল-বায়ু জন্তু-জানোয়ার-মানুষ সবকিছুর এক আবশ্যিক সমীকরণ হ'লো দেশ, যা

প্রতিনিয়তই পর্যায়ক্রমে এক একটি চূড়ান্ত বাস্তব অবস্থার ভিতর দিয়ে অনিবার্যভাবেই ছুটে চলেছে মহাকাল তথা ধ্রুবের দিকে—'

খোকার দিকে তাকালো মুরাদ। তার চোখমুখের ঘুটঘুটে সেই মেঘটা সম্পূর্ণ বিদূরিত এখন ; রুগ্ন অপ্রকৃতিস্থতা কেটে গিয়ে আলো ঝলমল করছে।

একটু আগেই কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে ঘরের ভিতরে নাটকের যে তুলকালাম দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো দু'জনের কারো মুখ দেখেই এখন তা অনুমান করা শক্ত।

'ভুল বলেছি কিছু ?'

'কি জানি !' গা ছেড়ে দিয়ে জবাব দিলো খোকা।

'বুঝতে পারছিস তো, দেশ কতোগুলো অবস্থারও নাম—'

'বুঝতে পারছি—' খোকা হেসে বললে,—' 'তুই কবিতা লিখিস খিস্তির ভাষায়, আর কথা বলিস কেতাবী ভাষায়, ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত !'

মুরাদ সংযম বজায় রেখেই বললে, 'তোর সমস্যাটা কি আমি তা জানি। তোর সমস্যা হ'লো দেশ আগে না মানুষ আগে ; দেশ বড় না মানুষ বড়। আসলে মানুষ নিয়েই যে দেশ এই সহজ সরল সমাধানটা তোর মগজে ঢোকে না, কেননা তোর ধড়ের উপর যে কাঁধ, কাঁধের উপর যে মাথা, তা একটা নয় গোছা গোছা। একটার জায়গায় দশটা মাথা হ'লে সে আর মানুষ থাকে না, সে হয় গাছ। গাছের সঙ্গে গুতোগুতি ক'রে কোনো লাভ নেই।'

বাদানুবাদ হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলতো, কিন্তু বাইরে দাপাদাপি আর হৈ-হল্লার শব্দ পেয়ে মুখ বন্ধ ক'রে উভয়েই উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো সেদিকে। সব কথার শেষ কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, এইসব কানে আসে। একটা বিক্ষুব্ধ মিছিল দারুণ চিৎকারে দিগ্বিদিক তোলপাড় ক'রে

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দেবো দেবো দেবো দেবো—রক্ত রক্ত রক্ত দেবো, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত ; দ্রুত চেহারা বদলে যাচ্ছে শ্লোগানের।

হঠাৎ ফটাশ ক'রে একটা শব্দ হ'লো।

'কি ব্যাপার ?'

খোকা আর মুরাদ দু'জনেই ছুটলো বারান্দায়। একটা চলন্ত রিকশায় মাইক বসানো ছিলো, টায়ার ফাটলো সেটার।

খোকা বললে, 'বুকটা একেবারে ধড়াশ ক'রে উঠেছিলো !'

'আমি তো ভেবেছিলাম মলোটভ ককটেল—' মুরাদ উৎসাহিত হ'য়ে বললে, 'গভর্ণর হাউসের গেটের কাছে কালই তো ছুড়েছিলো দুটো।'

মিছিলের কিছু লোক রাস্তার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছের দু'একটিতে কাঠবিড়ালীর মতো তরতরিয়ে উঠে পড়েছিলো একফাঁকে, ডাল ভেঙে ঝুপঝাপ ক'রে নামিয়ে দিচ্ছিলো তারা। প্রথমে হুটোপুটি, তারপর কাড়াকাড়ি ; অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় ন্যাড়ামুড়ো দশা দাঁড়ায় গাছগুলির। বিজয়কেতনের মতো ডালগুলো খাড়া ক'রে মিছিলের অগ্রভাগে ছুটলো আবার।

'কাল যে কি ঘটবে ! সাংঘাতিক একটা কিছু হ'য়ে যেতে পারে কালকের মিটিং-এ !' খুব চিন্তিত মুখে মুরাদ বললে, 'বলা নেই কওয়া নেই আচমকা কামান দেগে জেনারেল ডায়ারের মতো মানুষ মারতে পারে টিক্কাখান। শালারা মাল যা এক একখানা। ঘটে অন্য কিছু থাকুক আর না-ই থাকুক একটা ব্যাপারে মালগুলোর বেজায় মিল, সব ব্যাটার শুয়োরের গোঁ ! আমি চলি !'

'চলি মানে ?' খোকা ওর হাত চেপে ধরলো।

'এই মিছিলের সঙ্গেই চ'লে যাই বরং, হাঁটার কষ্টটা টের পাওয়া যাবে না। একটু থেমে বিচিত্র হেসে মুরাদ বললে, 'আর কিছু

সংকলনেরও সদ্‌গতি হবে এই সুযোগে। ভিতরে যা-ই থাকুক ঝোঁকের মাথায় ঝটাঝট কিনে নেবে অনেকে—'

'তুই একটা চিটার। দেশপ্রেমিকরা সবাই যদি তোর মতো চান্স-মোহাম্মদ হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত সবাইকে মুলো চুঁষতে হবে!'

'তোর কথা আগেই বলেছি—' বেরিয়ে যেতে যেতে মুরাদ বললে, 'তুই খোকাগাছ শিকড়সুদ্ধ মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাবি, আর কোনোদিন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবি না, করাতের টানে টুকরো টুকরো হ'য়ে যাবে তোর গুঁড়ি, তোর সব পাতা শুকিয়ে ঝ'রে যাবে, সামনে ঝড়!'

+

খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছিলো সবকিছু।

রেসকোর্সের মিটিং-এর পর থেকে অর্ধেক খালি হ'য়ে গিয়েছে ঢাকা শহর। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ শহর থেকে দাবানলের মতো গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামাঞ্চলের দিকে স'রে যাচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত শহরবাসীরা, পালাচ্ছে। গোটা দেশের একটি বিশাল চাকা মেঘহীন আকাশের মস্ত খিলানের গায়ে কাত হ'য়ে প'ড়ে আছে।

ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রেক্সে ঢুঁ মারলো খোকা।

পরিচিত বন্ধুদের বিশেষ কাউকে দেখতে পেল না। এক কোণে রহমান নুরুদ্দিন আর মণ্ডল টেবিলের উপর দৈর্ঘে-প্রস্থে এক বিগত প্রমাণ একটি প্রচারপত্র ফেলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে আছে। চেয়ার টেনে খোকাও ভিড়ে গেল।

কাগজটা একটা গোপন নির্দেশনামা। শত্রুর, অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর রক্তলোভী কুত্তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ শুরু হ'লে কিভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, সংক্ষেপে বোঝানো হয়েছে

এইসব। নারী ও পুরুষ—সংকটকালে কার কি কর্তব্য হবে পৃথক পৃথক ভাবে তার বর্ণনা এবং ব্যাখা দেওয়া হয়েছে।

একটা মাছের বাজার ; টেবিল চাপড়ানি, কাঁচ স্টেনলেস স্টীল আর চীনেমাটির একটানা টুংটাং-ঠুংঠাং এবং হোহো, সবমিলে একটা জ্যাজ, গমগম করছে হলরুম। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার সম্ভাবনা আছে কি নেই, অসহযোগ আন্দোলনের শেষ কোথায়, পয়েন্ট অফ নো রিটার্ণ, এইসব নিয়ে ফাটাফাটি তুলকালাম চলছে সমানে।

'আক্রান্ত হবার ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল—' ইস্তাহার থেকে চোখ তুলে খোকা বললে, 'কিন্তু প্রত্যাঘাতের ব্যাপারটা কিভাবে হবে শুনি! খালি হাতে, না পায়খানা ঘরের ঝাড়ু দিয়ে?'

'সেকথা পরে হবে—' নুরুদ্দিন ওর দিকে কাত হ'য়ে বললে, 'ওই পায়খানা ঘরের ঝাড়ুটা তুই পেলি কোথায়? ওটা তো শালা মুরাদের পৈতৃক সম্পত্তি, ক'দিন থেকে সমানে ওটা দিয়ে রেক্স ঝাড়ু দিয়ে যাচ্ছে!'

'মুরাদ আসেনি আজ?'

'হয়তো এসেছিলো, আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। না-ও আসতে পারে, খুব একচোট হয়ে গেল কাল, হাতাহাতি পর্যন্ত!'

'কার সঙ্গে?'

'কার সঙ্গেই বা নয়!' নুরুদ্দিন হাসতে হাসতে বললে, 'আমার সঙ্গে মুরাদের, মওলার সঙ্গে রহমানের, শেষে কতোগুলো অচেনা হঠাৎ দেশপ্রেমিকের সঙ্গে এক মুরাদ ছাড়া আর সকলের। যাকে বলে ফাটাফাটি!'

'সাংঘাতিক ব্যাপার!'

রহমান বললে, 'এটা তো এখন নৈমিত্তিক ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। তুই তো আর এ পথ মাড়াস না, জানবি কি ক'রে। আড়ালে আড়ালে করছিস কি, গোপনে ট্রেনিং না-কি?'

'কিছুই না—'

'বিশ্বাস হয় না—' মাথা নেড়ে রহমান বললে, 'এটা এমনই একটা সময় যাচ্ছে যা আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি, হয়তো আর আসবেও না। কিছু না ক'রে হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এখন। নির্ঘাৎ তলে তলে বোমা বানাচ্ছিস তুই !'

নুরুদ্দিন বাধা দিয়ে বললে, 'তুই-ও যেমন, বোমা না ঘণ্টা ! দেখছিস না কেমন গরুচোর গরুচোর চেহারা হয়েছে কুটকুমারের। দেদার মাগী চটকে বেড়াচ্ছে ফ্রি স্টাইলে ; ঠাউরে ছাখ, কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে ! লোপাট-বিজ্ঞানের আইনস্টাইন শালা, নে নে আরেক রাউণ্ড চায়ের কথা ব'লে দে !'

চায়ের ফরমাশ দিয়ে রহমান নুরুদ্দিনের দিকে একটা সিগ্রেট তাক ক'রে আলতোভাবে ছুড়ে দিলো। বললে, 'তুই তো আর বিপ্লবীদের দেখিসনি, তুই চিনবি কেমন ক'রে। ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই ও একটা কিছু নিয়ে মশগুল হ'য়ে আছে। আর ওপরে ওপরে দেখে এসব আন্দাজ করাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। এই তো তিন-চারদিন আগে, আমার ছোটভাইয়ের এক বন্ধু—স্কুল ফাইনাল দেবে ছোঁড়া, বললে লাগবে নাকি আপনার—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নুরুদ্দিন আকাশ থেকে পড়ার ভান ক'রে বললে, 'ওই অতটুকু ফচকে ছোঁড়া ওই কথা বলতে পারলে, সর্বনাশ !'

'আবে শালা, মাগী না মাগী না ! চিরকালই তো ফকিরনি হাঁটকে-চটকে বেড়ালি, ওটা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিস না কেন ? পিস্তল, পিস্তল, হাতে তৈরি পিস্তল ! পকেট থেকে বের ক'রে আমার হাত দিলো, বললে লাগলে রেখে দিন, এখন আমরা দিনে দুটো ক'রে বানাচ্ছি, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিদিন বিশটার প্রডাকশন হবে। বললাম কাজ হয়, বিচিত্র হেসে আমার হাতে

একটা গুলি দিয়ে বললে, আপাতত একটা চারপেয়ে কুত্তা দিয়েই পরখ করে দেখুন !'

মওলা ফোড়ন কেটে বললে, 'দেশের তাবৎ বিপ্লবীরা রহমানের ছোট ভায়ের বন্ধু ; ভাগ্যবান বটে আমাদের রহমান। সোর্সটা ওর ভালোই, ভাইয়ের মতো ভাই পেয়েছে একখান্ !'

চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় রহমান বললে, 'আর যা-ই হোক ভাইটি আমার কারো দালালি করে না ; রিলিফের কাজ পাড়ার সংগঠন এইসব নিয়ে মেতে থাকে।'

মওলা চ'টে উঠলো। বললে, 'দালালিটা দেখলি কোথায় ?'

'টিভির প্রোগ্রাম প্রডিউসার আবার কি, দালাল নয় ?' যেন তৈরি হয়েই ছিলো উত্তর দেবার জন্যে, এইভাবে বললে রহমান, 'মৌলিক গণতন্ত্রী চোঙামার্কা ম্যাড়ামার্কা টিপিকে এইচপিকে নিয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজতে ভাজতে যখন শালারা বুঝলে হাওয়া খারাপ, অমনি যেদিকে পড়ে পানি সেদিকে ধরো ছাতি ফর্মুলায় গণগণে আঁচে দেশপ্রেমের খিচুড়ি চাপিয়ে জ্বাল দিতে শুরু করেছিস। গামলায় কখন তেল রাখতে হবে আর কখন এ্যাসিড, তা তোরা অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই বুঝিস। তোরা অপর্চুনিস্ট, তোরা ক্যারিয়ারিস্ট, তোরাই সোস্যাল ক্লাইম্বার। তোরা হোয়াট নট। দাড়ি কামানোর রেজর থেকে শুরু ক'রে ফুলদানি হরলিক্স-এর বোতল গেঞ্জি গামছা ন্যাকড়া-চোকড়া মায় জুতো পর্যন্ত রাখা যায় তোদের শেল্ফে।'

মওলা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললে, 'এমনভাবে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছিস যেন নেতৃত্ব দিতে চাস।'

'চোখ রাঙানোর কি আছে এতে ? বাজে ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করিস তুই, সেধে ধোলাই খাস !'

'তোর কথা যদি সত্যি হয়, সারা দেশের লোকই দালাল !'

'তোর তো ওকথা মনে হবেই, নইলে আত্মরক্ষা হবে কি ক'রে! পারবি আমাকে তুই দালাল বলতে? বল দেখি।'

'গায়ের জোরে আমি কাউকে দোষারোপ করিনা—' একটু থেমে মওলা বললে, 'তোরা এই হঠাৎ দেশপ্রেমিকের দল আজকাল যে লাইনে কথা বলছিস তাতে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে যে মালী ফুল ফুটিয়েছে সে-ও দালাল, যে ধোপা সময় মতো কাপড় ধোলাই ক'রে দিয়েছে সে-ও দালাল; এমনকি মুরগি যদি ডিম পেড়ে থাকে, তা দিয়ে থাকে, বাচ্চা ফুটিয়ে থাকে, তাহলে সে-ও দালালি করেছে—'

নুরুদ্দিন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো আর সিগ্রেট ফুঁকছিলো। সে রহমানের পক্ষ নিয়ে বললে, 'কে দালালি করলে আর কে করলে না এসবে কিছু যায় আসে না। মালী কিংবা ধোপাও দালালি করতে পারে। মুরগিও যদি দালালি করে করুক, আপত্তি নেই, কেবল দেখতে হবে কার পাছায় কঙ্কের ছাপ আছে! তোমাদের ওই টিভির চাকরিটাই হ'লো কঙ্কে, যার কাজই অহরহ কেবল ছাপ দেওয়া—'

'কি ভাই, আপনারা ঝগড়া করছেন নাকি?' সবুজ টুপিপরা দু'জন স্বেচ্ছাসেবক তড়িঘড়ি ক'রে কাবাব উড়িয়ে হাতের চেটোয় মুখ মুছতে মুছতে এক কোণ থেকে উঠে এলো। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে সবিনয়ে বললে, 'আপনারা শিক্ষিত লোক এ সময়ে ঝগড়া করা শোভা পায় না আপনাদের। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমাদের সকলের; বঙ্গবন্ধু বলেছেন আমাদের যেন বদনাম না হয়, ষড়যন্ত্র চলছে!'

রহমান সামাল দিয়ে বললে, 'আপনাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, এখানে আমরা সবাই বন্ধু-বান্ধব; নিজেরা নিজেরাই আর কি, নিছক গল্প গুজব!'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। গল্প করুন আপনারা।' কাউন্টারে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে গেল উভয়ে।

'লেব্বাবা!' নুরুদ্দিন দরোজার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকে বললে, 'কি বুঝলি কি?'

রহমান বললে, 'এবার শালার বড় রকমের একটা কিছু ঘটবেই। সারা দেশটা যেন অধীর আগ্রহে গাল বাড়িয়ে রেখেছে—'

'কেন থাপ্পড় খাওয়ার জন্যে?' খোকা বললে।

'ঠিক তাই।'

'তাহলে আর লাভটা কি হ'লো?'

'লাভ আছে, লাভ আছে—' উল্লসিত হ'য়ে রহমান বললে, থাপ্পড়টা হবে কি ব্যাপার জানিস? বারুদের কারখানায় ফশ্ ক'রে একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে দেবার মতো। তারপরই যাকে বলে ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যাপার। সংগ্রাম। এতদিন তো শুধু শ্লোগান আর চিৎকারের খোসার মধ্যে বাদামের মতো দেখেছিস সংগ্রামকে, এবার দেখবি তার সত্যিকার সর্বগ্রাসী রাক্ষস মূর্তি। রক্তের বদলে রক্ত, সেই রক্ত হবে স্বাধীনতা!'

মওলা ভাসা ভাসা চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সবকিছু বন্যার তোড়ে হাতিয়া সন্দ্বীপের মতো ভেসে যাবে, আমাদের অনেকেই হয়তো থাকবে না—'

'ভালোই হবে—' নুরুদ্দিন রগড় ক'রে বললে, 'খামোখা দালালি-ফালালির ধুয়ো তুলে তোকে জ্বালাতন করার লোকও অনেক ক'মে যাবে। তখন ধুমসে তোদের ওই টিভিতে স্তাড়ামোশে স্তাড়ামোশে ক'রে 'দিলান্দে সওদে' করবি!'

'আমি নিজেও তো টেঁসে যেতে পারি?'

'প্রোগ্রাম প্রডিউসার মরে না, তোরা ম'রে গেলে টিভি চালাবে কারা? দালালির ট্রাডিশনটা কন্টিন্যু করতে হবে না? মাঝে মাঝে এমন গোলালু মার্কা কথা বলিস, ভপ্!'

নতুন একটা প্যাকেটের মুখ খুলে সকলের দিকে ধরে খোকা, তারপর আয়েশ ক'রে নিজেও একটা ধরায়।

৫—

রহমান বললে, 'তুই কিছু বল, নুরুদ্দিনটা কেমন ছটফট করছে দেখছিস না!'

খোকা বললে, 'লজিং-এ থেকে মা-মেয়ে দু'জনেরই জয়ঢাক মার্কা পেট বানিয়ে ফেলেছে বেচারা, তিন্তিড়ীয় চিন্তায় ওর এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা, কোনো মানে হয় না ওকে ঘাঁটানোর!'

নুরুদ্দিন ক্ষেপে উঠে বললে, 'তোর শালা মুখের কোনো ট্যাকসো নেই, একটা ডাস্টবিন!'

খোকা ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হ'লেও নিজেকে সামলে নেয় পরক্ষণেই। সে সংযত কণ্ঠেই বললে, 'বাজারে জোর গুজব, তাই বললাম—'

নুরুদ্দিন বললে, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তোদের মাথা না ঘামালেও চলবে!'

রহমান বললে, 'আগে তো পকেটে গুচ্ছের ছেঁড়া ন্যাকড়া আর ঢিল ভ'রে রাখতিস, এখনো চলে ওসব?'

মণ্ডলা বললে, 'তোর সেই নারী শিক্ষা মন্দিরের বার্ষিক স্পোর্টসের কথা মনে আছে এখনো? পাঁচিলের আড়াল থেকে ঢিল মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলি হার্ডল রেসের চারজন বেপর্দা ছুঁড়ির। একজন তো শেষ পর্যন্ত কানা-ই হ'য়ে গেল—'

নুরুদ্দিন বললে, 'তোদের কাজই হ'লো স্রেফ পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটা!'

'বাহাদুর ছেলে বটে—' রহমান বললে, 'ইজ্রেলিদের সঙ্গে লড়বার জন্যে সাতজনের একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠন করেছিলি তুই, মালকোঁচা মেরে রোজ প্যারেড করতো ওরা ভার্সিটির গ্রাউণ্ডে—'

'করতোই তো, তাতে খারাপটা কি দেখলি?'

রহমান বললে, 'খারাপ ভালোর কথা তো হচ্ছে না, তোর জোশের কথা হচ্ছে; কেমন যেন একটু নেতিয়ে পড়েছিস আজকাল,

তা না হ'লে আর্নল্ড টয়েনবির বয়ান তো এক সময় আমাদের জন্যে নিত্যবরাদ্দ ছিলো।'

নুরুদ্দিন বললে, 'আমি যা-ই ক'রে থাকিনা কেন, কারো দালালি করিনি কখনো। ছাত্রজীবনে সবাই একটা না একটা সংগঠনের পিছনে মাতামাতি ক'রে থাকে, আর তুই? নিজের দিকটা একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে দ্যাখ রহমান, উপরে খদ্দরের বর্ম, ইচ্ছে ক'রে বক সিগ্রেট ধ্বংস করা, যতো যা-ই করিস না কেন তোকে চিনতেও আমার বাকি নেই। খামোখা কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই, তুই চাপিস ক'রে যা!'

'হ্যাঁ সেই ভালো, তুই চাপিস ক'রে যা রহমান, ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তোর কম্মো নয়, ও হলো জিনিশ সদরঘাটের পিনিস, সারাসেন হিস্ট্রি গিলে গিলে ওর পেট জয়ঢাক হ'য়ে আছে; ধোপে টিকবি না তুই ওর কাছে; ওর তুলনায় চুনোপুঁটি তুই।' একটু থেমে খোকা বললে, 'ওয়ার্কস্ প্রোগ্রাম, জাতীয় সংহতিতে শালিমার গার্ডেনের ভূমিকা, হীররাঞ্জা আর খটক নৃত্যের সৌন্দর্য— মাত্র এই চারটে স্ক্রীপ্ট লিখেছিলি তুই টিভির জন্যে। তা-ও শালা মওলার চাপে প'ড়ে; ও শালাই তোকে ফাঁসিয়েছিলো। ও কিছু নয়, নুরুদ্দিনের কীর্তির তুলনায় এগুলো সব নস্যি। ও অনেক সিনিয়র আমাদের চেয়ে; খন্দকের যুদ্ধে ও ছিলো, বদরের যুদ্ধে ও ছিলো, ও তারিকের সঙ্গে জিব্রাল্টারে গেছে, জয় করেছে স্পেন, গ্রানাডায় আলহামরা ওরই তৈরি, এমন তাড়ান তাড়িয়েছিলো ও আবুরুশদকে—'

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নুরুদ্দিনের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে মওলা বললে, 'ভ্যালিয়মের কথা মনে পড়ছে নাকি সিনিয়র?'

'ফালতু কথা ছাড়!' নুরুদ্দিন খাঁউ ক'রে উঠলো।

রহমান বললে, 'কি যে বলিস, ভ্যালিয়ম তো আজকাল সবসময় ওর পকেটেই থাকে; হাতড়ে বের করতে দেরি হয় ব'লে

কুলুপের টিল রাখাও ছেড়ে দিয়েছে। প্রায়ই তো বলছে, হাত-পায়ের তলা ঘামে, মাথার ভিতরে একটা কাঠঠোকরা হরদম ঠোকর মারছে, জান ধড়ফড় করছে; চেকারের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে জানটা যে কোনো সময় চলন্ত বগি থেকে ঘপাং ক'রে লাফ দিতে পারে—'

'তাহলে খামোশ হ'য়ে যা ভাই!' মওলা বললে, 'হঠাৎ যদি ওর শরীর খারাপ করে!'

খোকা বললে, 'খ'চে গেলি নাকি নুরুদ্দিন? আর এক রাউণ্ড চা হ'য়ে যাক?'

'হোক।'

'তোর খারাপ লাগবে না?' রহমান টিপ্পনী কাটে।

'তা একটু লাগবে বৈকি! তবে সঙ্গে যদি সমুচা কিংবা ফ্রুটকেক ধরনের কিছু থাকে, অন্তত ভালো লাগাবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না!'

'চান্স লিচ্ছ ব্রাদার?' রহমান বললে, 'অবশ্য এ হ্যাবিটটা তোর আজকের নয়!'

গালে সমুচা পুরে খুব জাঁক ক'রে চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক মেরে নুরুদ্দিন বললে, 'এসব আমি গায়ে মাখিনা, যার যা ইচ্ছে বলুক, তৃপ্তি পাচ্ছে, পাক! আসল কথা যেটা সেটা এই, কুকুর কুকুরকে দংশন করছে!'

'রক্ষে করো, এক লাফে একেবারে চীনপন্থী হ'য়ে গেলি!'

'কেন চীনমাটির কাপে চা খাচ্ছি ব'লে?'

'ওই এক ধরন তোদের, কখনো কখনো এমন কথা বলিস যা নিজেরাও বুঝিস না ভালোমতন—' উর্ধ্ববাহু হ'য়ে আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে রহমান বললে, 'অবশ্য তোর দিক থেকে মস্ত একটা লাভ হয়েছে, পর পর কয়েকটা বছর একটানা সুর্মা দেওয়ার ফলে চোখের ব্যামোটাই ছেড়ে গেছে। নাকি এখনো ট্রাবল দেয়?'

খোকা বললে, 'ছেড়ে দে, বাজে কথা আর ভালো লাগছে না ! ও শালা লেবু, বেশি কচলালে তিতকুটে মেরে যাবে ! চল ওঠা যাক—'

মণ্ডলা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাকেও উঠতে হবে, কাজ ফেলে এসেছি অনেক। এইরে, আবার একঝাঁক স্বেচ্ছাসেবক ঢুকেছে, চল চল কাটি—'

রেক্স থেকে বেরিয়ে একটা পান গালে পোরে খোকা। এমনিতে সে পান খায় না ; কিন্তু রেক্স থেকে বেরুনোর সঙ্গে গালে পান গোঁজার কোথায় একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, প্রতিবারই বেরুবার সময় গলির মুখটায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ থেকে ফশ ক'রে পানের কথাটা বেরিয়ে যায়।

কোনদিকে যাওয়া যায় এখন। এই মুহূর্তে বাড়ি ফেরার কোনো ইচ্ছেই নেই তার, যদিও বের হবার সময় পৈ পৈ ক'রে ব'লে দিয়েছে রঞ্জু যতো শিগ্‌গির সম্ভব ফিরতে। নির্ঘাত কাঁইখাপ্পা হবে রঞ্জু। চটুক। খোকা মনে মনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়—বেশি আস্কারা দেওয়া চলবেনা, খবরদারির মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, ভবিষ্যতে আরো অসুবিধায় ফেলতে পারে ; আর কোনো গুণ থাকুক আর না-ই থাকুক, হাতের মুঠো শক্ত করার বিদ্যায় সব মেয়েই কমবেশি পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে।

এই এক স্বভাব খোকার, ঘরে থাকলে জুবড়ে প'ড়ে থাকে, বাইরে বের হ'লে ঘরের কথা ভুলে যায়। দীর্ঘ বিরতির পর যখন গুহা থেকে বের হয়, কিংবা নিশুতি রাত মাথায় ক'রে সারা শহরকে ঘুম পাড়িয়ে যখন ঘরে ফেরে, তখন মনে মনে নিজেকে সংশোধন করার জন্যে তৈরি হয় খোকা ; কিন্তু ওই পর্যন্তই !

আত্মীয়-স্বজন খুব কম নেই ঢাকা শহরে। আর্মানিটোলায় এক মামা আছে। সিদ্ধেশ্বরীতে চাচা থাকে, একেবারে আপন না হ'লেও

ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি ! খালা-খালু ভাই বোনেরা আছে মতিঝিল কলোনীতে। ওদের সঙ্গে মিশে বেশ আনন্দও পায় সে।

তবু এই নিরালম্ব মুহূর্তে ওসব পথে পা বাড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। আসল কথা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তার খুব একটা জমে না কখনোই। সাধারণত ধারে কাছে ঘেঁষে না, এড়িয়ে চলে ; নিজেরাই উপযাচক হ'য়ে প্রায় সকলেই কালেভদ্রে খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। অভিযোগের পাহাড় জমা হয়। এই নিয়ে রঞ্জুর সঙ্গে তার মাঝে মাঝে তীব্র কথা কাটাকাটি হয়। নিজের অনুপস্থিতিতে খোকা যখন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিরস্কৃত হয় তখন ভীষণ খারাপ লাগে রঞ্জুর ; খোকা নারাজ এসব কানে তুলতে, তার ধারণা এইসব মাখামাখি এক ধরনের স্থূল গ্রাম্যতা, সুখ বলতে সে বোঝে নিরুপদ্রব থাকা।

মতিঝিলে সেজ খালার ওখানে আগে প্রায়ই ঘোঁটা কাটতো খোকা ; সেজখালার কাছে তারা বড় আদরের পাত্র। সেজখালার ওখানে গেলেই মা'র কথা শুনতে হয় খোকাকে ; অনেক সময় তার ভালো লাগে না, একঘেয়ে মনে হয়, তবু শুনতে হয়। কি ভালবাসতো, কবে কি কথা নিয়ে রাগারাগি হয়েছিলো, কিভাবে দু'হাতে সব বিলিয়ে দেবার অভ্যেস ছিলো, রাজ্যির সব বৃত্তান্ত। বিয়ের পরও মা রেডিয়োতে গান গাইত, খ্যাতি অর্জন করেছিলো প্রচুর ; তখনকার দিনে কোনো রেকর্ড কোম্পানী ছিলো না ব'লে আপসোসের আর শেষ নেই সেজখালার।

এখন আর সহজে ও পথ মাড়ায় না খোকা। বেলী বড় হবার পর থেকে সেজখালার বাড়ি মাড়ানো এক রকম ছেড়ে দিয়েছে খোকা। মা'র স্মৃতি, যা অতিক্রুত তার কাছে ঝাপসা এবং ধূসর হ'য়ে গিয়েছে, বারবার একই সুরে তা নাড়াচাড়া করতে তার ভালো লাগে না। যা নেই কিংবা যা কখনো হবে না, তা নিয়ে অযথা মাথা

কোটাকুটি করাটাও তার কাছে এক ধরনের গ্রাম্যতা, এইসব ফাঁপা হা-হুতাশে সে পচা বাঁশপাতার গন্ধ পায়। সেজখালা একটা রোগের মতো এইসব হা-হুতাশ নিজের ভিতর পুষে রেখেছে।

বাইরে থেকে দেখলে একটি অতি সাধারণ মেয়ে বেলী, যার বয়েস পনেরো থেকে ষোলো। লেখাপড়ায় মাঝামাঝি, ফি-বার ক্লাসে ওঠে, স্কুলের ফাংশনে মনিপুরী নাচ নাচে, ফেব্রুয়ারীর বিশ তারিখে ছোট ভাইবোনদের ফুলচুরিতে উৎসাহিত করে, একুশে ফেব্রুয়ারী ভোর বেলা বাসন্তী রঙের লালপেড়ে শাড়ি প'রে শহীদ মিনারে যায়, চলনে-বলনে সুন্দর, সুশ্রী ; কিন্তু পরিবারের ভিতর থেকে খোকা দেখতে পেল এমন অনেক কিছুই করে বেলী যা বাইরে থেকে ধরা পড়ে না। দেদার চিঠি লেখে সে সিনেমা ম্যাগাজিনের প্রশ্নোত্তর বিভাগে, নীহারগুপ্তের বই পড়ে আর দাগ মারে, নিজে পয়সা চুরি ক'রে ছোটদের কাঁধে দোষ চাপিয়ে মার খাওয়ায়, এবং সেই পয়সায় ন্যুমার্কেটে শপিং করে, লিপস্টিক কেনে। এই বয়েসেই লিপস্টিকের তুখোড় সমঝদার ব'নে গেছে বেলী। পড়ার টেবিলের ড্রয়ারটা তার গুদামঘর। গুদাম বোঝাই হানি-ইন-গোল্ড, টিজিং পিঙ্ক, কফি ক্যারামেল—গুচ্ছের শেডের লিপস্টিক। ফরাসী সেণ্ট আর মেকাপের সামগ্রীও তার সংগ্রহে কম নেই। তলে তলে একাধিক ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেমও করে, অর্থাৎ ইচ্ছেমতো বাঁদরনাচ নাচায়।

যারা তার সঙ্গে প্রেম করে তাদের কেউ চিকন মোড়ের পায়জামা আর ঢিলে পাঞ্জাবি পরে। শ্রীযুক্ত চারুদত্ত আধারকারের জীবন থেকে ঝেড়ে কোটেশান দিয়ে প্রেমপত্র লেখে। পিছনে হাত বেঁধে আড়-চোখে ঠারেঠোরে চায় আর হরদম বাড়ির সামনে পায়চারি করে, এরই নাম নাকি ফিলডিং মারা। একটা ভোগেল, খোকা মনে মনে উচ্চারণ করে।

একজন আছে যে প্রায়ই রেসিং সাইকেলে চেপে বাড়ির সামনে রুটিন ক'রে টহল মারে। সাইকেলের উপর ঊর্ধ্বকমার মতো কুঁজো

হ'য়ে হুমড়ে প'ড়ে আপনমনে ফিক ফিক ক'রে হাসতে থাকে ছেলেটি। বাড়ির সামনে এলেই কায়দা মেরে দু'হাত ছেড়ে দেয় সে, তারপর উপরমুখো হ'য়ে বাঁইবাঁই ক'রে চালানো শুরু করে। এই সময় তার ঠোঁটে মাসকলায়ের ডালের এঁটোর মতো যে হাসিটি লেগে থাকে, তা দেখে মনে হয় কলোনীর এক হাজার ডবকা মেয়ে নিজেদের ভিতর চুলোচুলি ক'রে ওর দু'গালে চুমু খেয়ে যাচ্ছে। নির্ঘাত ছিট আছে ছোকরার মাথায়, খোকার মনে হ'লো।

সবচেয়ে মারাত্মক টাইপ যেটার সাধারণত সে আসে রাত্রে, একটা লাল রঙের ফিয়াট ক্যুপে চালায় ছোকরা। একটা ঝড়। ঝড়ের মতো গাড়ি চালায়। দিনের বেলায় খোকাহোক খোকাহোক খো—কাহোক ধরনের হর্ণ বাজিয়ে দু'চারটে পাক মেরে যায়। তার মানে তুমি চাগিয়ে ওঠো, সেই রাত্রিবেলায় আমি আসবো। লাইট পোস্টের নিচে গাড়ি পার্ক ক'রে দাঁড়াবো। তারপর টাইম ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের মতো গাড়িতে হেলান দিয়ে কায়দা মেরে দাঁড়িয়ে কিং সাইজের ফিলটার টিপড্ সিগ্রেট ধরাবো। ব্যাটাচ্ছেলে নিজেই একটা ফিলটার সিগ্রেট। পালক ছড়ানো সেদ্ধ হাঁসের মতো ফকফকে। ঝুলপি দু'টি বিরাট। মনে হয় স্রেফ তার ঝুলপি নামাবার জন্যেই সৃষ্টিকর্তা ওর হুঁকোর খোলের মতো চোখামার্কা মুখটা দিয়েছেন; ওই ঝুলপি না থাকলে ও নিজেই হুঁকোর খোলটা ড্রেনে ফেলে দিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ছোকরা। ভাবখানা এই: আমি একটা চোঙা, কোন শালা আমায় ফোঁকে, আসুক দেখি। যথেষ্ট আছে ওর বাবার, বোঝা যায়; শালা শুয়োরের বাচ্চা, মনে মনে গাল দেয় খোকা।

তবু, এদের হয়তো কোনো দোষই নেই, এক একবার মনে হয় খোকার। ওদের নাচাচ্ছে বেলী। অদৃষ্টের মতো ওদের খেলিয়ে মজা লুটছে; ওরা নাচছে, পাগলের মতো নাচছে।

একদিন তো সামান্য একটুর জন্যে নেহাত ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছে বেচারা ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি-পায়জামা! লম্বাঝুলপির ক্যুপে অতিশয় লাল চোখ হ'য়ে বুনো শুয়োরের মতো গাঁক গাঁক ক'রে দাবড়ানি দিয়েছিলো তাকে; কাদাপানিতে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আলুভর্তা হ'য়ে যেত বেচারা সেদিন। গাড়ির ভিতর থেকে চিৎকার ক'রে উঠেছিলো ছোকরা, মিডল স্টাম্প উড়িয়ে দেব, শালা!

সত্যি, বেলীটা একটা ভ্যাম্পায়ার!

এই বেলীর জন্যেই মতিঝিল কলোনীতে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে তাকে। বেলী চায় সে নাচুক; ওই তিনজনের মতো তাকেও নাচাতে চায় বেলী। খোকার ক্ষেত্রে বেলীর নিজের সুবিধে অনেক বেশি, এসব ব্যাপারে ওর হিশেব সাধারণত নির্ভুল হয়। কখন কিভাবে কার দিকে ঝুঁকলে ফায়দা ওঠানো যাবে ও তা সহজেই অনুমান ক'রে নেয়। পাকাপোক্ত একজন মেয়েমানুষের মতোই বেলী। সে ভালো করেই জেনে নিয়েছে তার হাতে আছে মাথা ঘুরিয়ে দেবার অতি প্রাচীন ডাকিনী বিদ্যা। এ ব্যাপারে অতটুকু মেয়ের যে নির্বিকারচিত্ততা, খোকাকে তা বিস্মিত করে।

'তুই একটা হাড়কিপ্টে, নিয়ে চলনা একদিন সিনেমায়—

'একটা ভ্যানিটি ব্যাগ প্রেজেন্ট করবি?

'তোর সঙ্গে একদিন সাংগ্রিলায় যাব, একজোড়া আইভরির দুল চাই আমার।

'তুই কি ধরনের মেয়ে পছন্দ করিস, নার্স টেলিফোন অপারেটর না হোলিক্রসে পড়া মেয়ে?

'কেমন লাগে রে বিয়ার খেতে?

'তুই ঘড়ি পরিস না কেন, আমার টাকা থাকলে একটা রোলেক্স কিনে দিতাম তোকে—

'আচ্ছা বয়ফ্রেণ্ডকে চুমু খেলে দোষ হয়?'

এক একদিন এক একভাবে এগোয় বেলী। কখনো এগোয় পা টিপে টিপে খুব সতর্কভাবে। অনুমানের বাইরে দু'ধাপ বেশি এগিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন ক'রে নেয়; অতর্কিতে নিজেকে গুটিয়ে নেবার ক্ষমতাও তার বিপুল, তখন মনে হয় ওর মতো সংযমী দ্বিতীয়টি আর নেই। নানান কথার রাশ মেলে ধরার আড়ালে সে আত্মশাসন করে, খোকা বোঝে।

আবার উল্টোটিও ঘটে দু' একদিন। তখন তার বাইরের ধীর-স্থির নিরুপদ্রব স্বভাবের আবরণ একটা দমকা হাওয়ায় খ'সে পড়ে।

একদিন দুপুরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিল বেলী। কোনো একটা চক্রান্ত ছিলো বেলীর, খোকা তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি; চক্রান্ত না থাকলে অকারণে কেউ অমন একরোখা অমন গোঁয়ার মূর্তি নিয়ে হামলে পড়ে না।

'ড্যাবড্যাব ক'রে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবি না, ভালো হবে না!'

'অমন বিদকুটে সং সেজেছিস কেন?'

'আমার ইচ্ছে, তুই বলার কে?'

'ঠিক আছে বাবা, ঘাট মানছি'—ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুয়েছিলো খোকা। হাতে একটা বই নিয়ে সেজখালার খাটে সে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। ঘরে বড়দের কেউ না থাকায় বেলীর তখন অবাধ স্বাধীনতা। সে পাখা মেলে দিয়েছিলো।

'কথা বলছিস না যে বড়? আবার ঘাড় ঘোরানো হয়েছে! যদি কথা না বলিস মা ফিরে এলে তোর নামে নালিশ করবো।'

'কি নালিশ করবি শুনি?'

'বলবো জোর ক'রে জাপ্টে ধ'রে তুই আমার গালে চুমু খেয়েছিস, ব্লাউস ছিঁড়ে দিয়েছিস; তুই মনে মনে যা যা কুচিন্তা করছিস, তার সবই বলবো। ভালমানুষী ছুটিয়ে দেব—'

‘তোর যা ইচ্ছে করিস, এখন ভাগ, এখান থেকে ভাগ !’

‘এহ্‌, কি আমার ভাগানেওয়ালা রে !’

‘বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বেলী। সেজখালা ফিরে এলে আমি নিজেই নালিশ করবো তোর নামে, মার খাওয়াব তোকে !’

‘কি ব’লে নালিশ দিবি ?’

‘সে তখন দেখা যাবে—’

‘বলবি জোর ক’রে জাপ্টে ধ’রে বেলী আমার গালে চুমু খেয়েছে, ঠিক আছে, তোর যা ইচ্ছে নালিশ করিস। মা তো আর বাঘ-ভাল্লুক নয় যে ক্যাঁচম্যাঁচ ক’রে একেবারে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ! না হয় দু’ঘা দেবে, ও আমার অনেক আগেই রপ্ত হ’য়ে আছে।’

‘তোদের এখানে আর আসছি না, দেখে নিস ! তুই একটা এঁচড়ে পাকা ফাজিল ছুঁড়ি, পৌনে তেরোটা বেজে গেছে তোর।’

বেলী ঠোঁট উল্টিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলো, ‘ব’য়েই গেল, উনি আসায় বেজায় লাভ হচ্ছে কিনা আমার। একটা সিনেমা দেখালেও তবু বলতাম হ্যাঁ দেখিয়েছিস একদিন, কি কঞ্জুস ! চোখ খুলে কথা বল না, আমি কি ধুলোবালি না গাছের আঠা ?’

‘ধুলোবালি তো বটেই, ধুলোবালিতে ভর করা জীবাণু—’

‘আর তুই একটা কেঁচো !’

ঝটিতি হাতের বই ছুড়ে মেরেছিলো খোকা, কিন্তু গায়ে লাগেনি, খিলখিল করে হেসে একপাশে স’রে গিয়েছিলো বেলী।

‘আমার নিজের বোন হ’লে জুতিয়ে সিধা ক’রে দিতাম তোকে !’

‘তোর নিজের বোনও তাহলে এইসব কথা বলে ?’ হেসে গড়িয়ে পড়েছিলো বেলী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

মোটকথা ও বাড়িতে এই ছিলো তার শেষ দিন। আর ওমুখো হয়নি খোকা এরপর। সেজখালার কানে কোনো কথা তুলে থাকবে বেলী, সেজখালার শীতল ব্যবহারে পরে এই ধরনের একটা সন্দেহ

জন্মেছে তার মনে। বেলীর পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, হয়তো ভিতরে ভিতরে কোনো কূট অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে তার সম্পর্কে মনগড়া কদর্য অভিযোগ তুলে সেজখালার মন ভেঙে দিয়েছে সে। মাঝে মাঝে সেজখালা যখন তাদের ওখানে আসে তখন তার দিকে এমন ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকায় যে খোকার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। তার বুঝতে অসুবিধে হয় না বেলীর দুঃসাহসী চালে সে ফেঁসে গিয়েছে। বেলী যে তাকে খোঁজে খোকা তা-ও জানে; তার ইচ্ছে যেভাবেই হোক খোকার সঙ্গে একটা যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলতে। দু'একবার হুট ক'রে একা একা চ'লে এসেছে সে বাড়িতে, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি; খোকা টিপে দিয়েছে রঞ্জুকে, সর্বক্ষণ ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে থেকেছে রঞ্জু।

কোন দিকে যাওয়া যায় এখন? স্টেডিয়ামের চারপাশে ঘোরাঘুরি করার ফাঁকে ফাঁকে মনস্থির করতে থাকে খোকা। এখন ইচ্ছে থাকলেও মতিঝিলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বেলী কি কদর্য একটা নাম। যে সব বন্ধুরা কালেভদ্রে পাড়ায় যাতায়াত করে খোকা তাদের মুখে শুনেছে ওখানে নাকি খুব কদর বেলীর। মালা গেঁথে খোপা সাজায় মেয়েরা। বাবুদের হাতে হাতে শোভা পায়। ধুন্ধুমার গান-বাজনার ফাঁকে আধমাতাল বাবুর গলায় চৌদ্দ হাত দুর থেকে নির্ভুল তাক ক'রে বেলীর মালা পরিয়ে দেওয়াটাও একটা পুরানো বৈঠকী কেতা। বাড়িউলি মাসিদের বেজায় পছন্দ ওই বেলী নামটি। কচুর লতি খাওয়ার মতো নেহাত সখ ক'রে যে নামটা রাখা হয় তা নয়, কমলি বিমলি পটলি মায়া শান্তি টগর—এসবের চেয়ে ওই নামটা নাকি বেজায় পয়মন্ত। কলতলায় ঠ্যাং ছড়িয়ে ব'সে গোড়ালিতে ঝামা ঘষতে ঘষতে অবাক বিস্ময়ে দ্যাখে ওই নামের গাছটির ডালপালা তো দুরের

কথা, পাতাটি পর্যন্ত দেখা যায় না এত পাখি উড়ে এসে বসে ওই গাছে। নুরুদ্দিন গল্প করেছিলো, একবার সে ভৈরবের বাজে-পট্টিতে এমন এক মাসিকে দেখেছে, যার সবকটি মেয়ের নামই বেলী। কালা বেলী, ধাওলা বেলী, শুটকী বেলী, ধুমসী বেলী, গন্নাকাটা বেলী, খ্যাংরাগুপোরপিয়ারী বেলী, তাড়কা রাক্ষসী বেলী, দেখন-হাসি বেলী, খাঁদা বেলী, টিপকপালে বেলী, খুঁচিখোপা বেলী, বড়িখোপা বেলী, এইভাবে আলাদা ক'রে ডাকা হয় তাদের। এলাকাটির নামই নাকি বেলীর বাগান। হাটে-বাজারে-গঞ্জে প্রায়ই নানা জাতের গুজব রটে সেখানে ; বেলীর বাগানকে কেন্দ্র ক'রেই যাবতীয় গুজবের উৎপত্তি। যেমন, বেলীর বাগানে আজ জোড়াখুন হয়েছে, বেলীর বাগানে আজ হিজড়েরা জব্বোর নাচ নেচে গেছে, বেলীর বাগানে আজ একজনের পেট থেকে দু'মাথাওয়ালা সাপ বেরিয়েছে, বেলীর বাগানের মাসির কাড়া নতুন নাঙ বদনার ভিতরে ভ'রে সত্তর ভরির গহনা নিয়ে ভেগেছে, এসব।

ভালোই মানিয়েছে নামটা বেলীর !

স্টেডিয়ামের চারপাশেই ভিড়, ছোট ছোট দলে ভাগ হ'য়ে জটলা পাকাচ্ছে মানুষজন। রিকশার উপর দাঁড়িয়ে স্প্রিং-এর মতো হাত নেড়ে মরিয়া হ'য়ে বক্তৃতা দিচ্ছে কয়েকজন : আপনারা ভুলে যাবেন না, ভাইসব, মনে রাখা দরকার গোটা বিশ্ব আজ আমাদের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ হঠকারিদের চক্রান্তে প'ড়ে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। তাকিয়ে দেখুন সংগ্রামী ভিয়েতনামের দিকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কীভাবেই না সেখানকার সংগ্রামী জনতা মুকাবিলা ক'রে চলেছে, এবং একই সাথে প্যারিসে চলছে শান্তি আলোচনা। আলোচনার পথ যদি রুদ্ধ হয়, সংগ্রামের ক্ষেত্র তো আছেই—

হঠাৎ মুরাদের কথা মনে প'ড়ে যায় খোকার। সাত তারিখে একসঙ্গে রেসকোর্স গ্রাউণ্ডে যাবার কথা ছিলো, শেষ পর্যন্ত তা আর হ'য়ে ওঠেনি! একটা খালি রিকশা দেখে খোকা এগিয়ে গেলেও তার আগেই লাফিয়ে উঠলো অপর একজন উস্কোখুস্কো যুবক। উঠেই চিৎকার ক'রে বললেঃ বন্দুকের নল থেকেই বেরিয়ে আসে প্রকৃত ক্ষমতা, ভাইসব, ভাইসব, আপনারা যাত্রা থিয়েটার দেখে অনেক সময় নষ্ট করেছেন, এবার হাতে অস্ত্র তুলে নিন—

হই হই ক'রে ছুটে এলো একদল, শুরু হ'লো ছোটাছুটি, হুটোপুটি। খোকা দৌড়ে একটা রিকশায় উঠলো। বললে, 'রামপুরায় চলো—'

রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকে মুরাদরা। অকারণে মুরাদের জন্যে মন খারাপ হ'লো খোকার। ঐদিন সত্যিই তর্ক করতে নেমে যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে ফেলেছে সে। শুধু অপমানই নয়, যথেষ্ট আঘাতও দিয়েছে। সন্দেহ নেই সেদিন সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ওভাবে মুরাদের বড়বোনের প্রসঙ্গ তোলা উচিত হয়নি তার; নোংরামির একেবারে চূড়ান্ত ক'রে ছেড়েছিলো সে। মুরাদ নিজেও খুব ভাল ক'রে জানে, রেক্সে ব'সে গুলতানি মারার সময় বন্ধুরা প্রায় সবাই তার বোন লুলু চৌধুরীকে নিয়ে কদর্যভাবে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করে, কেবলমাত্র খোকা এই দলের বাইরে। 'লুলু চৌধুরীর পাছাটা ঠিক যেন একটা আধমুনে ধামা, একটা চোস্ত খাজুরাহো', 'লুলু চৌধুরীর নদগদে পাছা দুলিয়ে হাঁটা, ঢুলঢুলে চাহনি আর ফিক ক'রে হাসা দিয়ে গোটা আদমজী জুট মিলটাই কেনা যায়', 'সেদিন স্বপ্ন দেখলাম ন্যাংটো হ'য়ে ঘোড়ায় চেপে সারা ঢাকা শহর টহল দিচ্ছে লুলু চৌধুরী, সাক্ষাৎ লেডি-গোদিভা', 'লুলু চৌধুরীর শাড়ি পরার স্টাইলটা মারাত্মক, মনে হয় আর দেড় সেকেণ্ডের ভিতর গা থেকে সব আবরণ ঝরঝর ক'রে খুলে প'ড়ে যাবে', হামেশাই মওলা রহমান নুরুদ্দিনদের মুখ থেকে এইসব মন্তব্য শোনা যায়।

লজ্জিত হয় খোকা। মুরাদ তাকে আলাদা চোখে দেখে বলেই বিয়ার খেতে খেতে খুব দুঃখ ক'রে নিজের বোনের প্রসঙ্গ তুলেছিলো। মনের জোর আছে মুরাদের, খোকা নিজেই মর্যাদা রাখতে পারেনি। খুব ছোট হ'য়ে গিয়েছে সে।

রিকশায় ব'সে খোকা ভাবতে থাকে, দিন দিন আমি একটা চাঁড়াল হয়ে যাচ্ছি, চাষাভুষোর মতো যখন মুখে যা আসে তাই বলি, ভারসাম্য রক্ষা করতে পারিনা কোনোকিছুর ; লুলু চৌধুরী যে পাড়ার খাতার নাম লেখানো বেশ্যা নয়, তার বন্ধুর বড় বোন, একথা ভালো ক'রে ভাবা উচিত ছিলো। তার সেদিনের সেই কদর্য মন্তব্য থেকে দুয়ের তফাত ধরা যায়না।

এমন-ও হ'তে পারে ভবিষ্যতে কোনো একসময় বেলীর মতো উচ্ছন্নে যাবে রঞ্জু। তখন ! রঞ্জু সম্পর্কে বন্ধুরা তার কানে বিষ ঢাললে কেমন লাগবে তা শুনতে ! এখনো যে রঞ্জুকে নিয়ে পিছনে পিছনে মনগড়া মন্তব্য করছে না, জোর ক'রে তা' বলা যায়না। ওদের যা গাছে গরু চরানো স্বভাব, তাতে মন্তব্য না করাটাই অস্বাভাবিক।

খোকার চোখের সামনে কয়েকটি রাস্না ও লিকলিকে লতা মৃদু মৃদু দোল খায়, এবং লতাগুলি এক সময় সাপ হয়ে যায়। তার বুকের ভিতরকুঠরির ফাঁকা কামরাগুলি গম গম ক'রে বেজে উঠে।

সাবধান হ'তে হবে এখন থেকে। মুরাদের পক্ষে যা অসম্ভব তার কাছে তা অতি সহজ। লুলু চৌধুরীকে কড়কে দেবার ক্ষমতা মুরাদের নেই ; রঞ্জুকে অতি সহজেই শাসনে রাখতে পারে সে, বয়েসে ছোট, এখনো চোখ ফোটেনি ওর। খোকার ভিতরের কর্তব্য-বোধ দুপুরের রোদের মতোই চড়চড় ক'রে ঝল্‌সে উঠতে থাকে। লুলু চৌধুরী অথবা বেলীর মতো, অথবা দু'জনের মাঝামাঝি অন্য কারো মতো পাগলামির নেশা কোনো অসতর্ক অসংলগ্ন মুহূর্তেও

যাতে ওর মগজে ভর না করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে সেদিকে, রঞ্জুকে হ'তে হবে রঞ্জুর নিজের মতো ; অবিচল নির্মেঘ গগনপটে একফোটা রঞ্জুকে আলতোভাবে শুইয়ে নিপুণ সতর্কতায় একটার পর একটা ড্যাগার ছুড়তে থাকে সে, যেন চারপাশে গেঁথে যায়, যেন ড্যাগারের মৃত্যু আঁটুনি থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসতে না পারে। এক হাত-পা ছাড়া নির্বোধ অসহায়তাকে শাসন করতে থাকে খোকা ; অবাক হয় সে নিজেই, তার স্বাভাবিক সংযম এক মুহূর্তে যেভাবে কালিমালিপ্ত হ'য়ে যায়, তাতে আর নিজের উপরে সে তেমন আস্থা রাখতে পারে না। ধুম্রকেশর বিতৃষ্ণা প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠে খোকার। নিজের সঙ্গে এ এক ধরনের জটিল রহস্যময় বোঝাপড়া ; অথবা ভৌতিক পাশাখেলা, কানাকড়িও বাজি ধরে নি, তবু অগোচরে সর্বস্বান্ত হ'য়ে চলেছে।

রঞ্জুর ব্যাপারে তাকে সতর্ক থাকতে হবে, ঢিলে দেওয়া চলবে না, জটিল কাটাকুটিতে ভ'রে যায় খোকার মন। অশ্বারোহী তাতারের মতো ধুলো উড়িয়ে তুমুল হ্রেষারবে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত ক'রে মেয়েদের বয়েস আসেনা। ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে কখন যে হানাদার বয়েস এসে কানায় কানায় ছলাৎ-ছল চলকে উঠে তার কোনো হদিস পাওয়া যায়না। যেমন বেলী। এমনিতে আলস্যময় ঘুমের মতো চোখের পাতায় জড়িয়ে আছে সব হঠাৎ একদিন এমন দুষ্কর্ম ক'রে বসলো যে সকল ধারণার ভিত পর্যন্ত ন'ড়ে গেল। বোঝা গেল বড় হ'য়ে গিয়েছে বেলী, তার বয়েস হয়েছে। বয়স না হ'লে সাহস দেবে কে, বাহাবা পাবে কার কাছ থেকে ? বয়েসের এই উন্মত্ত হাততালির ক্রমবর্ধমান পরিণতির নামই লুলু চৌধুরী ; দুনিয়াসুদ্ধ উচ্ছন্নে গেলেও নিজের উদগ্র বয়সের কাছে নিজেকে তুঙ্গ ক'রে তোলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হবে না তখন, এ এক ধরনের বন্য হিংস্রতা, লোমশ মনোবৃত্তি, তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ স্তনভারাক্রান্ত দামাল লুলু চৌধুরী হার্ডল রেসের তীব্র

প্রতিযোগিতায় বিশ্বময় ক্যাঙ্গারুর পালের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে, আর তাদের পায়ের তলায় প’ড়ে নাকমুখ দিয়ে গলগল ক’রে রক্ত তুলছে রঞ্জু।

খোকা ক্লান্ত হ’য়ে পড়ে। কি অবসাদ ঝিঁঝিঁ ঝিনঝিনে শরীরে! বিতৃষ্ণা,—এতো বিতৃষ্ণা কেন, আকাশ ঝামরে ঢল নামছে বিতৃষ্ণার।

রামপুরার দিকে বাঁক নিলো রিকশা।

রাস্তার মাঝখানে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের উপরে সদ্য বাঁধানো একটি কবর; কয়েকদিন আগে একজন ছাত্রকে এখানে নির্মমভাবে হত্যা করেছে কাণ্ডজ্ঞানহীন সৈন্যরা। সিলকের কাপড়ে বড় বড় লাল অক্ষরের একটি লেখা কবরের উপরে ফরফর ক’রে উড়ছে—‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’ নিদারুণ চিত্ত-চাঞ্চল্যে ভিতরের নিস্তরঙ্গ হ্রদ ঘুলিয়ে উঠলো খোকার। সারা দেশ চামুণ্ডার মতো রক্তলোলুপ জিভ বের ক’রে রেখেছে, রক্ত দাও, রক্ত দাও, আর রক্ত দাও। কবিতার একটি বই বেরিয়েছে কয়েক মাস আগে, তারও নাম ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’, জোর ক’রে দেওয়া নাম। রেসকোর্সের মিটিং-এর যে ভাষণ, সেখানেও ওই একই কথা, ‘রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো—’

এদেশে বৃষ্টির পানিতে আর ফসল ফলবে না, ফসল ফলাতে হ’লে বৃষ্টির বদলে চাই রক্ত। পুষ্পকুঞ্জ শুকিয়ে যাবে যদি তার গোড়ায় রক্ত না ঢালা হয়। এদেশে কেউ কবিতা পড়বে না যদি তা রক্তে লেখা না হয়। ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো’ কিংবা ‘লাল ঢাকা রাজপথ, লাল ঢাকা রাজপথ’ এই হ’লো গান, কেবলমাত্র এইসবই গাওয়া হবে।

লেবু ময়না নুরুদ্দিন মুরাদ লুলু চৌধুরী বেলী সবাইকেই কি রক্ত দিতে হবে? কতোখনি রক্ত? নখ কাটতে গিয়ে যতোখানি, না একটা হাত বাদ হ’য়ে গেলে যতোটা ঝরে? না কি গলাকাটা রক্ত,

ফায়ার ব্রিগেডের নলের পানির মতো হলহলিয়ে বগবগ ক'রে যা বেরিয়ে আসবে !

রিকশার উপরে খোকা দুলতে থাকে।

আমাকেও দিতে হবে ?

রঞ্জুকে ?

আমাকে রঞ্জুকে, রঞ্জুকে আমাকে ?

যদি না দিই ?

দেবোনা ! এক মুহূর্তে ব্যারিকেড হ'য়ে যায় খোকা ; আমরা রক্ত দিতে শিখিনি ! যে দেশ রক্ত দাও রক্ত দাও ব'লে দুশো বছর ধ'রে চিৎকার ক'রে চলেছে আমাদের কেউ নয় সে, দেশমাতৃকা তুই নস ! যে দেশ কেবলমাত্র জন্মান্ধ রাক্ষসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রকে তোড়ের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ভূরিভোজের উৎসবে নিমন্ত্রণ করে হাঙরকে, তাকে বিশ্বাস নেই, দেশমাতৃকা তুই নস !

প্রবলভাবে আলোড়িত হ'তে থাকে খোকা।

দু'পাশের গাছপালা লক্ষ লক্ষ সবুজ টুপিপরা স্বেচ্ছাসেবক এখন খোকার কাছে। তার মনে হ'লো নির্বিকার স্বেচ্ছাসেবকেরা জড় ভাঙছে এখন। ফিশফিশ ক'রে বলছে, 'আপনার মানসিক শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব আপনার নিজের, ষড়যন্ত্র চলছে !'

অসম্ভব দীর্ঘ হাঁহাঁ খাঁখাঁ চৈতালী দুপুর লাঠি হাতে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে গাছগুলো, পাখিরা উড়ে যাও, নীড় রচনা করতে পারবে না এখন এখানে, কালবৈশাখী আসন্ন !

তপ্ত বাতাসের হলকা গাছের পাশ কাটিয়ে কি তীব্র ব'য়ে যাচ্ছে ! অনেক উঁচুতে উঠেছে আকাশ, ফেলে দিয়েছে সব মই ; সকল নিস্তব্ধতার ভিতর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে ভয় নিষ্পলক চোখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। কে চায় তার গায়ে আঁচড়টি লাগুক ?

বাংলাদেশ, তুমি শুয়ে আছো অর্ধেন্দু দস্তিদার হ'য়ে, থেকে থেকে কাতরাচ্ছো, বোমা বিস্ফোরণে নিদারুণ ক্ষত-বিক্ষত তোমার মুখ ; তোমার মুখ পুড়ে গেছে। বাংলাদেশ, তুমি ম'রে গেছ প্রীতিলতার মতো বিষপান ক'রে। বাংলাদেশ, তুমি বুলেটগাঁথা আনোয়ারা, কোলের শিশুকে স্তন দিতে চাও ? বাংলাদেশ, তুমি রাক্ষসী, একটা শালিকের মতো শিকার করেছো মতিয়ুরকে। বাংলাদেশ তুমি কারফিউ, গভীর রাতে যার বস্ত্রহরণ করতে গিয়ে মারা পড়েছি আমরা। তুমি টর্ণাডো, বাংলাদেশ তুমি সাইক্লোন, বারবার সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও তুমি আমাদের, হাঙরের পাকস্থলীতে ব'সে সুর ক'রে তেলওয়াত করি আমরা। তুমি গর্ভিণী পুলোমা, বাংলাদেশ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে রাক্ষস কাম, একটু পরেই সে তোমাকে বলাৎকারের চণ্ড লালসায় হাত মুচড়ে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবে গভীর নিভৃত অরণ্যে। বাংলাদেশ তুমি কিছুই নও, আবার তুমি সব ; তুমি বাংলামদের একটা বোতল, মাতাল হবার তুঙ্গ অভিপ্রায়ে খালি ক'রে গড়িয়ে দিয়েছি তোমাকে, এখন পায়ে পায়ে গড়াবে তুমি। বাংলাদেশ তুমি একটা সস্তা মদের দোকান, কে শুঁড়ি কে-বা তার সাক্ষী তার কোনো হিশেব নেই সেখানে। বাংলাদেশ তুমি একটা ছমছমে ঘুটঘুটে বেশ্যালয়, যার সব কুঠরি এক একটি বেলীর বাগান, যেখানে কখনো কাউকে ভূতে পায়, যেখানে জং ধরা কজার মতো কর্কশ হিজড়েরা খ্যামটা নাচে, যেখানে যাট বছরের বেতো মাসী নাও ধরে, যেখানে তোবড়ানো বদনায় সাতনরীর হার ঝুমকা অনন্ত কানপাশা, যেখানে তাস পাশা জুয়া কড়িখেলা, যেখানে উপদংশ আর সন্নাস রোগ, যেখানে শিকড় তুকতাক ঝাড়ফুঁক ঢোলের মতো মাদুলি, যেখানে ক্ষুধার্ত কাকের ঠোঁটে গর্ভপাতের লাল নাড়ি, যেখানে ঝুলকালিধরা ঘুলঘুলির টিমটিমে প্রদীপের শিখা বরাবর উদ্বন্ধনে ঝোলা জোড়াপা শূন্যে দোল খায়।

লাল পেটিকোটের কষি আলগা ক'রে বজবজে ঠাণ্ডা কুয়োতলায় নীল-সবুজ শ্যাওলায় উদোম বুকে পিঠে বগলে ভোসা কিংবা গামছা কিংবা ছোবড়া কিংবা চিবানো শজনে কিংবা দুর্বা কিংবা চড়ুইপাখির বাসা ডলছো তুমি, বাংলাদেশ তুমি একটা লক্ষ বছরের বেতো ডাইনী মাসি, ঘেয়োকুত্তার মতো নাঙ ধরেছো এক হাজার, ঘাটের মড়ার মতো নাঙ ধরেছো এক হাজার, ধোয়াঘাটের মুলোর মতো নাঙ ধরেছো একহাজার, আর তোমার থলথলে পেটের রবরবা চর্বিতে সুড়সুড়ি না দিয়ে, তোমার সিংহমার্কা তামার পয়সা লালপলা আর কড়িগাঁথা ঘুনসি জড়ানো গরুর গাড়ির চাকার ক্ষতে দুষ্ট কোমরের খরখরে তেঁতুলেবিছায় তেল মালিশ না ক'রে, খালপাড়ে যাবার অছিলায় বদনা হাতে সেই সব নাঙ ফতুর ক'রে দিয়েছে তোমাকে তিনহাজারবার !

'মাইগ্রেশন টু নো-হোয়্যার', তুমি একটা ছবি বাংলাদেশ ; কতোগুলি খঞ্জ—যাদের দেহ যুদ্ধের একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, ক্রাচে ভর দিয়ে উড়ে চলেছে হাওয়ায়, সম্মুখে দিগন্ত, যা অসম্ভব ধূসর মূক ও বধির, তীব্রভাবে ছুটছে। হাওয়ার উজানে ছিন্নভিন্ন মলিন পোশাকের পাল তুলে দৃপ্ত খেলোয়াড়ের মতো বারবার নেচে রুগ্ন দিগন্তের অন্ধকার পরিব্যাপ্ত বিশাল অনিশ্চয়তার কুহকে ছুটে চলেছে। এখন আর তুমি মোদিল্লিয়ানীর সেই দীর্ঘায়িত সুঠাম রতিমঞ্জরি নও, আত্মতৃপ্ত নির্ভার নিদ্রার আলস্যে যা মদিরার কুঞ্জ হ'য়ে আছে (নিদ্রা তার নগ্নতাকে ঢেকে রেখেছে, ল্যাট্রিনে ব'সে একদিন মনে হয়েছিলো কথাটা) পুরু বিছানায়, যেখানে একটি টিকটিকিও এখন ঠিক ঠিক ঠিক ক'রে উঠবে না পাছে শিরশিরিয়ে ওঠে আলস্যময় নিদ্রা ; এমন কি নির্দয় নিয়তি যে—শুধুমাত্র একটি দোমড়ানো সেপ্টিপিন কুড়িয়ে পরম সার্থকতায় ফিরে যাবে সে-ও।

মোদিল্লিয়ানীর এই ছবিটি তার প্রিয়। ক্ষীণ কটিতট থেকে প্রসারিত একটি উজ্জ্বল নির্লিপ্ত রাস্তা, এই রাস্তা-ই নিয়ে যাবে উরঃস্থলের মধ্যভাগে, যেখানে ধর্মাধর্মের উপাসনালয়, পরম পবিত্র সুষুপ্তি।

কি নিটোল, কি তুঙ্গ, অচঞ্চল ; এমন কোমল যা সামান্য একটি দুর্বাকুচির আচ্ছাদন-ও সইতে অক্ষম। স্তন তো নয়, অম্লান দুটি স্তূপ কলরবহীন এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ; কবিতার যা আত্মা, পরিশ্রান্ত কিন্তু স্বপ্নময়, হৃদয়ে যা ভার হ'য়ে থাকে সর্বক্ষণ, কিন্তু সুরম্য সুগোল, যেন পবিত্র সমাধি মন্দির, খালি পায়ে যেতে হবে ওখানে, যেন পাশাপাশি অঞ্জু আর মঞ্জুর কবর।

ধূলিময় মাতাল হাওয়া গরগর ক'রে নাক ঘ'ষে গেল খোকার শরীরে। মনে হয় একটা প্রাচীন রথ নারীদের বর্ষব্যাপী উৎসবান্তে সিথেরা থেকে হাওয়ায় ভেসে চলেছে। ছাগচর্ম আচ্ছাদিত এক একটি স্মৃতি নৃত্যগীত গীতনৃত্যে উল্লোল রমণীর মতো ক্রমাগত কানের দু'পাশে তাম্বুরা বাজাতে থাকে। শুকনো পাতার গন্ধে বাতাস ভরপুর, যেন ঝাঁঝালো মদের গন্ধ, কখনো কটু কখনো তীব্র, কখনো চুল ধ'রে নাড়া দিয়ে যায়।

চলন্ত রিকশা থেকে কখন যে স্বপ্নসলিলে ঝুপ ক'রে প'ড়ে গিয়েছে খোকা তা টের পেল না ঃ

অনেক অনেকদিন আগের কথা, এক দেশে এক সেগুনবাগিচা ছিলো, সেখানে এক নীলাভাবী ছিলো। একদিন এক নির্জন দুপুরে আমি কাঁচুমাচু খোকাব্যাঙ সেই নীলাভাবীর বাড়িতে রুরুরুরু গিয়েছিলাম। একা, সেই নীলাভাবী, যার শরীর পুষ্পকরথের মতো, যার ঠোঁটে বিদ্রুমের আভা, একা ছিলো। যখন নীলাভাবীকে রুরুরুরু একা পেলাম, আশ্চর্য খুব আশ্চর্যভাবে এক অতিবেল তন্দ্রার রুরু কোমলতার ভিতর আমার মনে হ'লো, এখন এই মুহূর্তে এখানে যা যা নেই, অনুপস্থিত, আমাকে চোখে চোখে রাখে, পাহারা দেয়, দিবালোক যেমন পাহারা দেয় অরণ্যকে। উহুরু! আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম। ইন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরের সঞ্চারমান মূর্চ্ছা একগুচ্ছ গোলাপ হ'য়ে রুরু রুরু শোভা পাচ্ছিলো বাবেলের বুরুজের মতো ফুলদানিতে ; তির তির তির তির ক'রে তখন তা

কেঁপে উঠলো তিনকোণা চিৎকারে। উন্মাদনার অন্ধকারে দিব্য বিভা হ'য়ে রুরুরুরু ঝল্‌সে উঠলো সেই ঘর। পাখির হালকা পালক ছড়ানো ঘরময়, এবং একটি বিড়াল, নরোম যার শরীর, কামদ উষ্ণতায় ভরপুর। বিড়াল দেখিয়ে দিলো রুরুরুরু নীলাভাবীকে। নীলাভাবী দেখিয়ে দিলো রুরুরুরু বিড়ালকে। রুরুরুরু পরস্পর পরস্পরকে। আমি দেখিয়ে দিলাম রুরুরুরু গোলাপগুচ্ছকে, গোলাপগুচ্ছ রুরুরুরু আমাকে, রুরুরুরু পরস্পর পরস্পরকে। বিড়াল বললে রুরুরুরু গোলাপ একদিন শুকিয়ে যায়; আমি পিঠ দেবো। নীলাভাবী বললে রুরুরুরু বিড়াল কখনো মিথ্যে বলে না, দ্যাখোনা চোখ নেই ওর পিছনে, বিড়াল কখনো রুরুরুরু গোলাপকে ভয় পায় না—থাকুক কাঁটা, দংশন; বিড়াল জানে চার চারটি তার থাবা ঃ একে যোনী, দুয়ে স্তন, তিনে দংশন, চারে বন্ধন,—গোলাপের কাঁটার চেয়েও বেশী নখ সেই চার থাবায়। শেষে সরোবর ভেঙে ডোম্বী মৃণাল খায়, ডোম্বী তোমাকে আমি মারবো ব'লে রুরুরুরু খোকাকাহ্নুপাদ বিড়ালের পিঠে সওয়ার হলাম। আমি জানিনা কে আমাকে বারুণী দিলো, আমি জানিনা কে আমাকে ডমরু শোনালো, আমি মদকলকরী খোকাকাহ্নুপাদ বিড়ালের পিঠে সওয়ার হলাম। আমি জানিনা কে আমাকে বারুণী দিলো, আমি জানিনা কে আমাকে ডমরু শোনালো, আমি মদকলকরী খোকাকাহ্নুপাদ প্রবেশ করলাম নলিনীবনে—রুরুরুরু রুরুরুরু রুরুরুরু।

কীটদষ্ট ঠাকুমার ঝুলির কতোগুলো পাতা বাতাসের ফেনার মতো ফরফর ক'রে ঘুরপাক খায় চতুর্দিকে। দৃশ্য পরম্পরায় কতোগুলি ছবি অলীক ছায়ানৃত্যে মূর্ত হ'য়ে উঠে; এইভাবে আমার জীবনের একটি অধ্যায় অভাবনীয় আকস্মিকতায় সমাপ্তির রেখা টেনেছিলো, তীক্ষ্ণ ঘৃণায় এফোঁড়-ওফোঁড় হ'য়ে যায় খোকা। একটা রিকশা ধ'রে পাগলের মতো ঘুরেছিলো সে। একবার সেকেণ্ড

ক্যাপিটালের দিকে, একবার নীলক্ষেতের দিকে, এদিকে ওদিকে চতুর্দিকে ঘুরেছিলো কেবল, কোনো হুঁশজ্ঞান ছিলো না, এবং গভীর রাত মাথায় ক'রে ঘরে ফিরেছিলো। আমি একটা লোচ্চা, তার এইসব মনে হয়েছে,—আমার কোনো বাচ-বিচার নেই, আমি একটা লম্পট, কামুক; আজ আমি নীলাভাবীকে বিছানায় কাত করেছি, সবে শুরু আমার, হয়তো কালই আবার হন্যে হ'য়ে উঠবো, আবার কাউকে চিত করবো। পরপর কয়েকটা দিন এইভাবে সে নিজের মনের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করেছে। ভিতরের গরল ভুড় ভুড় ক'রে গেঁজে উঠেছে, পরিত্রাণ চাই! পরিত্রাণ! পাগলের মতো বেরিয়েছে ঘর থেকে, মুরাদকে চাই, সারা শহর খুঁড়ে বের করতে হবে মুরাদকে; শেষ পর্যন্ত সালামারে নিয়ে গিয়েছিলো মুরাদ, এপ্রিলের একটি আস্ত রাত বমি ক'রে সে ভাসিয়ে দিয়েছিলো। সেই একবারই তার মনে হয়েছিলো মদ কি কুচ্ছিত জিনিস; অস্থিরতার দাপটে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলো সে।

অঞ্জু আর মঞ্জু হারিয়ে গিয়েছিলো কিভাবে?

বাথরুমের আয়নার মতো সেই পারদ ওঠা ঝাপসা ছবিটি ঝাড়পোঁছ করে খোকা; মামাবাড়ির পুকুরের শ্যাওলাধরা শানে পা হড়কে পানিতে ছিটকে পড়লো অঞ্জু, আর দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল মঞ্জু; তারপর অঞ্জু মঞ্জুকে টেনে নিয়ে গেল আরো গভীরে, শেষে অঞ্জু আর মঞ্জু, মঞ্জু আর অঞ্জু, অঞ্জুমঞ্জু মঞ্জুঅঞ্জু গলা জড়াজড়ি ক'রে ডুবে মরলো।

এক সময় মুরাদের ওখানে পৌঁছালো খোকা।

মুরাদ বললে, 'এসে ভালোই করেছিস, আমাকে শুধু শুধু ফিরে আসতে হ'তো তোর বাড়ি থেকে। এই একটু পরেই বেরুচ্ছিলাম।'

চা এলো এবং কিছুক্ষণ গুলতানি চললো। ঠিক ভালো লাগছিলো না খোকার, এমন কি একথাও একবার মনে উঁকি দিলো, আজ ঘর থেকে না বেরুলেই বোধ হয় ভালো ছিলো।

'জমছে না, চল বাইরে বেরোই বরং—'

'একটু বোস, বড়বোন তোর সঙ্গে কথা বলবে।'

খোকার ভিতরে একটা হাইপোস্টাইল হল হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে এ কথায়।

'আমার সঙ্গে আবার কিসের আলাপ?'

'কি জানি—'গা ছেড়ে দিয়ে আলগোছে বললে মুরাদ।

একটু পরেই লুলু চৌধুরী ঢুকলো ঘরে। এসে একটা বেতের চেয়ার টেনে বসলো। হেসে জিগেশ করলে, 'কেমন আছেন?'

'ভালো-ই।'

'আপনাদের ওদিকে কেমন, গণ্ডগোল আছে কোনো রকম?'

'না, তেমন আর কই।'

'বড্ড হৈ চৈ আমাদের এইদিকটায়। কতো রকমেরই যে তোড়জোড়, একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে গেছি!'

'কোথায় আর! আমি তো দেখছি দিব্যি আরামেই আছেন আপনারা!'

'তাই বুঝি মনে হচ্ছে?'

খোকার মনে হ'লো নীলাভাবীর সঙ্গে কোথায় একটা মিল আছে লুলু চৌধুরীর।

হঠাৎ কি মনে ক'রে মুরাদ উঠে গেল এইসময়। খোকা দেখলো তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লুলু চৌধুরী, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ধারালো চাহনি, সুন্দরী হেডমিস্ট্রেস কিংবা মেট্রন হ'লে যেমন হয়।

'একটা কথা জিগেশ করবো আপনাকে, আপত্তি নেই তো!'

'আপত্তি কিসের!' খোকার ভিতরটা এইবার সত্যি কেঁপে ওঠে।

'আমি কারো নাম ধ'রে বলবো না। আমার চলাফেরা গতিবিধি এইসব নিয়ে মুরাদের বন্ধুদের অনেকেরই শুনি দারুণ মাথাব্যথা। আজকাল নাকি সেটার প্রকোপ একটু বেশী রকমেরই দেখা যাচ্ছে, এটা কি সত্যি?'

খোকা আমতা আমতা ক'রে বললে, 'এসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। মধ্যে থেকে আমি বিপদে প'ড়ে যাচ্ছি—'

'আপনি সংকোচ করছেন কেন? আমি কিন্তু আপনাকে বাদ দিয়েই কথাটা পেড়েছি। আপনার কাছে একথা তোলার একটাই কারণ, ওর বন্ধুদের ভিতর একমাত্র আপনার সঙ্গেই আমার আলাপ আছে, আপনাকে ভালো ক'রে চিনি। ছিটেফোটা তো দুরের কথা, অন্যদের কাউকে চিনিই না, আর যে সব কথা শুনি তাতে চেনার খুব একটা ইচ্ছেও নেই। সংকোচ করবেন না, আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন!'

খোকা অপরাধীর মতো বললে, 'কিছু কিছু আলাপ হয় বৈকি!'

'কি ধরনের আলাপ?' বেশ জোর দিয়ে জিগেশ করে লুলু চৌধুরী।

'আন্দাজ ক'রে নিন।'

'এটা কিন্তু ঠিক বললেন না। অন্যেরা কে কোন চোখে আমাকে দ্যাখে, তাদের কার কি রুচি শিক্ষা-দীক্ষা তা-তো আর আমার জানা নেই, খুব শক্ত আমার পক্ষে তা আন্দাজ করা—'

'আপনি বরং মুরাদের সঙ্গে আলাপ করবেন, মোটামুটি ও সবই জানে—'

'ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—' একটু থেমে হাসতে হাসতে লুলু চৌধুরী বললে, 'শুধু কথা হয়েছে বললে ভুল বলা হবে, ছোটখাটো একচোট হ'য়ে গেছে বলতে পারেন দু'জনের মধ্যে!'

'মুরাদ নিশ্চয়ই কিছু কিছু বলেছে আপনাকে?'

'বলেছে, তবে সেগুলো না বললেও ওর চলতো। নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি কাদা ছোড়াছুড়িকে আমি সাংঘাতিক ঘৃণা করি। ও যা যা বলেছে সেসব শুনে মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না। দেখুন, এটা অত্যন্ত সত্যিকথা যে আমার চাল-চলন আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো নয়, বরং কিছুটা আমার নিজের মর্জি মতো বলতে

পারেন। মানে এই নয়, আমি অসাধারণ একটা কিছু। এখানে আমার পেশার কথাটা সবাইকে শুধু ভেবে নয়, বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। তুচ্ছ কানাকানিতে কান পেতে ব'সে থাকলে আমার চলবে না এ তো আপনি বোঝেন-ই। নিরর্থক সময় অপব্যয় করা ছাড়া ওটা অন্য কিছু নয়। আমাকে সব সময় আমার পেশার কথা ভেবে চলতে হয়। আমি যে কোনো কিছুর পরোয়া করি না, লাজ-লজ্জার ধার ধারিনা, এসব নিয়ে কানাকানি করা আর নিছক বদনামের জন্যে বদনাম করা এক কথা। এসব একপেশে কানাকানির আমি মোটেই দাম দিতে শিখিনি।'

লুলু চৌধুরী থামলেও কোনো প্রত্যুত্তর করলো না খোকা। কেবল তার ভয়টা অনেক হালকা হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। যথেষ্ট সংযমী মহিলা এই লুলু চৌধুরী, প্রায় আচ্ছন্নভাবে মনে হ'লো খোকার, কিন্তু হঠাৎ এ ধরনের আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজনটা কি সে তা ধরতে পারলো না, সুকৌশলে ধোলাই চলছে না-তো!

অর্ধেক জবাবাদিহি দুনিয়াসুদ্ধ সবাই মেনে নিয়েছে এমনি ধরনের এক ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলো আবার লুলু চৌধুরী, 'তারপর ধরুন অনেক সময় অসময়ে ঘরে ফিরতে হয় আমাকে। অনেক সময় অনেক মহারথীদের সঙ্গে সময়ও কাটাতে হয়। চাকরির খাতিরে আমি এসবে বাধ্য। এমন নয় এটা সময়ের অপচয়, এতে আপত্তি কিসের! আমার চাকরির ধরনটাই অমন। দুনিয়ায় হাজারো রকমের মানুষ। কতো রকমের মেজাজ, অহমিকা, তেত্রিশ কোটি কমপ্লেক্স, মাথা খারাপ হ'য়ে যায় ভাই—'

একটু থেমে মৃদু হেসে লুলু চৌধুরী বললে, 'কারো কান ধ'রে কাজ আদায় ক'রে নিতে হয়, কারো হাত ধ'রে ; অনেক সময় গলাও ধরতে হয় অনেকের। যে উদ্দেশ্যে কান ধরা, সেই উদ্দেশ্যেই গলা

ধরা। সব ব্যাপারটাই আগাগোড়া একটা টাস্ক, যা সম্পূর্ণ-ই অফিশিয়াল। অবশ্য অনেকে এক্সপ্লয়টেশনও ব'লে থাকে ; ব'য়েই গেল আমাদের। প্রিমিয়ামের মোটা অঙ্কের মূল্য ক'ষে পা বাড়াতে হয় আমাদের। এই যে ব্যাঙের ছাতার মতো চারদিকে গণ্ডায় গণ্ডায় কোম্পানি গজিয়ে উঠছে, ভুশ ভুশ ক'রে ফেঁপে উঠছে চোখের পলক না পড়তেই, এসব কি আর এমনি এমনি-ই! চাকরি চাকরি-ই, যে যার নিজের প্রতিভা দিয়ে কোম্পানির ভিত মজবুত ক'রে চলেছে ; ঠুনকো অহমিকা, সস্তা চক্ষুলজ্জা, অমুকে ছুঁয়ে দিলো, জাত গেল, এসবের চেয়ে এফিশিয়েন্সি রিপোর্টের দাম আমাদের কাছে ঢের ঢের বেশী! পারলে বন্ধুদের বলবেন, নিরর্থক কষ্ট ক'রে তাঁরা যেন আমার জন্যে দুশ্চিন্তা না করেন, আমি চাই না আমার নিজের ভালোমন্দের ব্যাপারে অন্যেরা খামোখা মাথা ঘামাক—'

খুবই বিরক্তিকর, তবু শুনতে হয় খোকাকে! সে চোখ কুঁচকে বললে, 'আপনি গ্রাহ্যের মধ্যে না আনলেই হয়—'

'তা-তো বটেই! তবু অনেক সময় এসব তেতো লাগে। হাজার হোক আমরা তো মানুষই!'

খোকা বললে, 'আপনার এই শেষের কথাটি আপনার চাকরির জন্যে খুবই বেমানান, বিশেষ ক'রে এতোক্ষণ যা যা বললেন, যেভাবে বললেন, তা যদি মানতে হয়—'

'এতোক্ষণ যা বলেছি সেটাই ঠিক—' লুলু চৌধুরী জোরের সঙ্গেই বললে, 'আমি যদি সাতহাত ঘোমটা টেনে ঘরে ব'সে থাকি আপনাদের বন্ধুরা আমাকে মাসোহারা দেবে? তাহলে না হয় তাই করা যাবে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি তাহলে—'

খোকা বললে, 'জিগেশ করে দেখবো এক সময়।'

'তাই করবেন, খুব জানতে ইচ্ছে করে আমার—' হাসতে লাগলো লুলু চৌধুরী।

'আসল কথা আপনি একজন মেয়েমানুষ, এটাই শেষ পর্যন্ত বুঝলাম।'

'আপনার কি সন্দেহ ছিলো এতে ?'

খোকা বললে, 'তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই, আপনি নিজেই জানেন, এসব কথা তুলে আপনি নিজেই হেরে গিয়েছেন।'

কিছু একটা ভেবে অল্পক্ষণ পরেই লুলু চৌধুরী বললে, 'আপনি তো কিছু করছেন না, চেষ্টা করছেন নাকি কোনোদিকে ?'

'কই আর।'

'আসুন না আমার সাথে !'

'কি রকম ?'

'আমাদের কোম্পানিতে আসুন—'

'এখনো সে রকম কিছু ভেবে দেখিনি !'

'আমি বলি কি, একটা এজেন্সি নিয়ে ফেলুন, আমার ধারণা আপনি ভালো করবেন।'

খোকা হেসে বললে, 'ভালোই বলেছেন—'

'আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি।'

'তা-তো বুঝতেই পারছি, সব ব্যাপারেই আপনি সিরিয়াস !'

'আপনি চিন্তা করুন—' নড়েচড়ে ব'সে লুলু চৌধুরী বললে, 'আমি আপনার ওখানে একদিন আসবো !'

'কিন্তু—'

বাধা দিয়ে লুলু চৌধুরী বললে, 'কোনো কিন্তু নয়, আপনি মনে মনে তৈরি হ'য়ে থাকুন, বাকিটা আমি ক'রে দেবো, আমার বিশ্বাস একটু উদ্যোগ নিলেই আপনাকে চালানো যাবে।'

'চল উঠবি না-কি ?' মুরাদ ঢুকলো এই সময়।

লুলু চৌধুরীও উঠে দাঁড়ালো। চোখমুখে প্রসন্নতার ছাপ। বিদায় নিয়ে টুপ ক'রে বেরিয়ে এলো খোকা।

দু'জনে হাঁটা শুরু করলো। চারপাশে মানুষজনের মেলা। অনেকের হাতেই লাঠি। মেয়েরাও হাতে লাঠি নিয়ে ঘোরাফেরা করে ছোট ছোট দলে ভাগ হ'য়ে। হাবভাবে, চাল-চলনে মনে হয় ওই জিনিসটা হাতে থাকলেও ওর গুরুত্ব সম্পর্কে ওদের তেমন কোনো ধারণা নেই। এই এখনো কয়েকটি মেয়ে লাঠি হাতে কলরব করতে করতে ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। বোঝা যায় সকলেই স্কুল কলেজের মেয়ে। কিন্তু তবু, বেশ কিছুদিন যাবৎ রাস্তাঘাটে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না মেয়েদের। ধীরে ধীরে ম'রে যাচ্ছে ঢাকা শহর। নিভে আসছে। কোনো কোনো অঞ্চল একেবারে খাঁ খাঁ, নীরব; সন্ধ্যার পর অকারণে গা ছমছম করে।

'এতোক্ষণ জর্দা কিমাম দেওয়া খুব কোম্পানির খিলি খাওয়াচ্ছিলো নিশ্চয়ই?' হঠাৎ জিগেশ করে মুরাদ।

'ঠিক বুঝলাম না সবকিছু, ধোলাইটা বোধহয় আমার ওপর দিয়েই গেল!'

'অসম্ভব কিছু নয়। একচোট হ'য়ে গিয়েছে আমার সঙ্গে। ওকে যে বোঝাতে পারবে, সে এখনো মায়ের গর্ভে!'

'দারুণ ভড়কে গিয়েছিলাম, যাই বলিস, প্রথমে তো বুক টিপ টিপ করছিলো—'

একটা দেশলায়ের কাঠি দাঁতে খোঁচাতে খোঁচাতে মুরাদ বললে, 'ওসব ভয় নেই। সাধারণত ও খারাপ ব্যবহার করে না, বাইরের কেউ হ'লে তো নয়-ই। এটা ও যে ভাবেই হোক রক্ষা ক'রে চলবেই। হিশেব ক'রে কথা বলার মতো ক্ষমতাও ওর আছে, ভালোমতো মিশলে তুই-ও বুঝতে পারবি।'

'তুই নিশ্চয়ই আমার নাম তুলেছিস, এটা উচিত হয়নি তোর!'

'কিছুই যায় আসে না ওতে। ওর গুডবুকে না হয় নামটাই কাটা যাবে তোর, তাতে আর কি ! শুনলি না কিভাবে কথা বললে ? কখনো খুলে মেলে জোর গলায় অভিযোগ তুলবে না ও, বিচার চাইবে না ; এমনভাবে কথা বলবে যেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মতামতগুলোকেই নিছক যাচাই ক'রে নিচ্ছে। ও জানতো যে কোনো মুহূর্তে আমি এসে তুলে নিয়ে যাবো তোকে। হাতে বেশী সময় থাকলে দেখতিস সমস্ত-ব্যাপারটা তোর কাছে কেমন অফিসিয়্যাল ক'রে তুলতো। একটা আস্ত ছ'তলা কোম্পানির পাকস্থলীতে আঁইটাঁই ক'রে মরতিস তখন। ছেড়ে দে। ওকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই ; ওর আর আমাদের পথ তো আর এক নয়, ওর পথে ও চলবেই—'

খোকা বললে, 'এখন আলাদা হ্লেও, এক পথও তো হ'তে পারে ? ধর এজেন্সি একটা নিলাম, তখন ?'

'বলেছে নাকি এসব ?'

'তা-না হ'লে আর বলছি কেন ?'

'সর্বনাশ ! দ্যাখ কেমন ঘাড়ে চাপে এবার, সকাল সন্ধ্যা পাগল ক'রে তুলবে তোকে !'

অনেকক্ষণ পর খোকা বললে, 'এইভাবেই হণ্টন মারবি না-কি ?'

'রিকশা নে, ভালো লাগছে না কিছু। চল কোথাও গিয়ে বসি দু'দণ্ড !'

এক একবার ঘরে ফেরার ইচ্ছে উঁকি মারছিলো খোকার মনে। রঞ্জুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে আজ। সেজখালাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব'লে দিয়েছিলো রঞ্জু বারবার। কিন্তু মুরাদকে ছেড়ে এই মুহূর্তে হুট ক'রে চ'লে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। গাছের ভিজে পাতার গায়ে নিরুপদ্রব জ্যোৎস্নার আলোর মতো এক নরোম উজ্জ্বলতায় চিকচিক করছে মুরাদের চোখমুখ। মাঝে মাঝে চলকে

উঠছে, নিজেকে চেপে রাখতে পারছে না, কিছু একটা প্রবলভাবে তোলপাড় ক'রে চলেছে তার ভিতর, বুঝতে বাকি থাকে না খোকার।

খোকা বললে, 'কোথায় যাবি ? কোনো বারে নয় কিন্তু !'

'সেরকম পয়সা কোথায় !'

'পয়সা আছে, কিন্তু ইচ্ছে নেই।'

'তা বটে, ইচ্ছে থাকলে পয়সা থাকে না। আউটার স্টেডিয়ামের দিকে যাওয়া যাক বরং—'

'ওদিকে বেজায় ভীড়ভাট্টা। মিটিং হুটোপুটি আর খেল তামাশায় কাদার মতো বজবজ করছে মাঠটা। যে শালার মুখে সবেমাত্র বুলি ফুটেছে সে-ও একচোট বক্তিমে না ঝেড়ে যাচ্ছে না ; সাধে কি আর বলে হুজ্জতে বঙ্গাল ! আমি দেখলাম, শালার বিকেলে মাঠে খেলা দেখার মতো একদল লোকের মিটিং-এর নেশা আছে ; আসনগেড়ে ব'সে পুটুর পুটুর করে চিনেবাদাম ভেঙে গালে পোরে আর লেকচার শোনে, হাত তুলতে বললে হাত তোলে, শ্লোগান দিতে বললে শ্লোগান দেয়, আপার চেম্বার খালি আরকি !'

মুরাদ গায়ে মাখলো না। সে বললে, 'রমনা রেঁস্তরায় যাবি ?'

খোকা রাজি হ'লো।

গিশগিশ করছে রমনা রেঁস্তরা। লেকের উপর ঝুলন্ত কাঠের পাটাতনে চেয়ার টেনে বসলো দু'জন। মুখচেনা অনেকের সঙ্গেই চোখাচোখি এবং হাসি বিনিময় হ'লো খোকার ; এক একজন এক একটা দল নিয়ে ব'সে আছে, ফোয়ারা ছুটছে যুক্তিতর্কের।

আড্ডা শেষ ক'রে উঠে যাচ্ছিলো প্রভাত গঞ্জালেস ও ইয়াসিন। খোকার দিকে চোখ পড়ায় ফিরে এলো আবার।

ইয়াসিন বললে, 'থাকিস কোথায়, দেখাই পাওয়া যায়না !'

খোকা বললে, 'ইছাপুরায় ফিরে যাসনি এখনো ?'

'আর ইছাপুরা। মানুষজন ঢাকা ছেড়ে সব গ্রামাঞ্চলে ভাগছে আর আমি গ্রাম ছেড়ে ঢাকায়, দেখি বরাতে কি জোটে !'

'সব লীলাখালা তো এখন ঢাকায়—' মুরাদ বললে, 'গোটা দুনিয়ার চোখ এখন ঢাকার দিকে; বিশপকেটওয়ালা নীলপ্যান্টে পথঘাট থৈ থৈ!'

গঞ্জালেস একটা হাই তুলে জড় ভাঙলো। বললে, 'সেই দুপুর থেকে এখানে, মেরুদণ্ড টনটন করছে, আর ভালো লাগছে না—'

তার একটা হাত ধ'রে টেনে বসালো ইয়াসিন। বললে, 'আরে বোস বোস, তুই-ই এখন একমাত্র ভরসা সকলের, যাবো তো আমিও!'

'কথাটা মন্দ বলিস নি—'মুরাদ বললে, 'পালানোর দরকার হ'লে তোর ওখানে গিয়ে উঠবো; কলাকোপা-বান্দুরা জায়গাটাও মন্দ নয়!'

গঞ্জালেস বললে, কে যে কাকে জায়গা দেবে এখন এখানে ব'সে সেকথা তোলা মুশকিল, মাথার কাপড় তুলে আমাদেরই যে একদিকে ছুটতে হবেনা একথা জোড় দিয়ে কারো পক্ষে বলা অসম্ভব। ভেতরের খবর খুবই খারাপ।'

খোকা বললে, 'তোর তো আবার সব বিদেশীসূত্রের খবর। ভাগ্যিশ কনস্যুলেটে কেরানির চাকরিটা ছিলো, তা না হ'লে দেশের ভাগ্যে যে কি ঘটতো!'

গঞ্জালেস বললে, 'অবস্থা খুবই কেরোসিন, ঠাট্টা নয়!'

ইয়াসিন মনমরা হ'য়ে বললে, 'দেশের অবস্থা যে খারাপ দিকে যাচ্ছে তা বোঝার জন্যে তোর ওই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ছাঁদা করার দরকার নেই, এমনিই বোঝা যায়। ইশ্, সারারাত কিভাবেই না কুকুর কাঁদে! আমার শালা ঘুমই আসেনা, মনে হয় একটা মড়ক লাগবে—'

মুরাদ বললে, 'কুকুর আমাদের ওদিকেও কাঁদে কিন্তু এটা একটা রদ্দিমার্কা কুসংস্কার!'

ইয়াসিন চ'টে উঠলো। বললে, 'এড়ো তর্ক করাটা তোর একটা রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যা দেখতে পাচ্ছি ; নিছক নিজের কোট বজায় রাখার জন্যে গায়ের জোরে তুই কথা বলিস। কি ক'রে জানলি এটা কুসংস্কার। অভিজ্ঞতা আছে তোর কোনো ?'

মুরাদ বললে, 'লেখাপড়া শিখে এদেশের মানুষের কোনোদিন কোনো উন্নতি হবে না, সব শালা পিছনেহাঁটা মানুষ, তোদের দেখলে তাই মনে হয় আমার—'

ইয়াসিন ক্ষেপে বললে, 'কুকুরের কান্না সম্পর্কে তোর কোনো ধারণাই নেই !'

'বললাম তো, অর্ধেক খনার বচন আর অর্ধেক পিথাগোরাস, তোরা হচ্ছিস এই মাল। দেশের ক'টা লোকে বিশ্বাস করে যে মানুষ চাঁদে গেছে ? দাসত্বটা আমাদের চিরকেলে স্বভাব !'

গঞ্জালেস উঠে দাঁড়ালো। বললে; 'আমি আর বসতে পারছি না, কিছু কাজ আছে, আবার দেখা হবে—'

সন্ধ্যা পার হ'য়ে গিয়েছে। রাত্রির রঙ এখনো ঘনীভূত হয়নি ; ধূসর আচ্ছন্নতার গায়ে অনুলিপ্ত ঘননীল, আকাশ আড়াল হ'তে আর খুব বেশী দেরি নেই। খুব দূরে কোথায় রক্তাভ ধূম্রকুণ্ডলী হলহল ক'রে উর্ধ্বমুখে ঠেলে উঠছে। আকাশের গায়ে ঝাঁকা একটা খেপলা জালের মতো ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ছে ; ভূগর্ভের কোনো এক প্রেতায়িত ধূম্রাগারের খোল ফেটে গনগনিয়ে বেরিয়ে আসছে, কখনো বা একটা স্তম্ভ, আকাশকে যা নিদারুণভাবে বিদ্ধ করবে। খোকার চোখের সামনে পার্থেনন তৈরি হয়।

'কোথাও আগুন জ্বলছে—' খুব আচ্ছন্নভাবে বললে ইয়াসিন।

'কোন দিকে মনে হয় ?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

চতুর্দিকে নীল অন্ধকার মসলিনের ফিনফিনে যবনিকার মতো নড়ছে, দুলে দুলে উঠছে। দীর্ঘ বনস্পতি আর অবগুণ্ঠিত কুঞ্জবনের ক্ষীণ নিশ্বাসের পালকে নিজেকে সাজিয়ে এক নির্ভার জিপসী ঘাঘরা দুলিয়ে যেন উদ্যানময় নৃত্য করে ফিরছে। পানির ছাদে ব্যাঙের লাফ, ঝিঁঝিঁপোকার ঐকতান, সামান্য কয়েকটি খুচরো শব্দেই অর্থময় হ'য়ে উঠছে সন্ধ্যা; মনোরম যবনিকা স'রে গেলেই রহস্যময় ছায়ানৃত্যের জিপসী তার কাঁধ থেকে দড়াম ক'রে কাঠের এই পাটাতনে একটি ছাগশিশু ছুড়ে দেবে, ভিতরে ভিতরে এইসব অনুভূতি সিঁদ কাটে।

'আমি হাঁপিয়ে উঠছি মুরাদ, আর ভালো লাগছে না—'

'তোর তো মাঝে মাঝেই এরকম হয়। বলতে পারিস কখন তোর ভালো লাগে?'

'ঠিক সে রকম নয়, মনে হচ্ছে দমবন্ধ হ'য়ে মারা যাবো!'

'দূরের ওই আগুনটা দেখেই বোধহয় এ রকম মনে হচ্ছে তোর। আমার এসবে কোনো প্রতিক্রিয়াই হয় না—'মুরাদ বলসে, 'যা অনিবার্য তা ঘটবেই, তোর আমার যতই বুক টিপটিপ করুক!'

ইয়াসিন কিছু একটা ভেবে ঘড়ঘড়ে গলায় বললে, 'বন্দুকের দোকানগুলো সব লুট হলো, জেল ভেঙে কয়েদীরা সব ভাগতে শুরু করছে, এখানে আগুন, ওখানে আগুন, লুটপাট, মোটেই ভালো লক্ষণ না এসব!'

'ওই তো বললাম, সব ঘটনার মুখ একই দিকে, ভালোভাবে যাচাই ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবি।'

খোকা গা ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আমার একেবারেই ভালো লাগছে না, তুই খুলে বল।'

মুরাদের চোখমুখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। নিষ্পলক দৃষ্টিতে খোকা তাকে নিরিখ ক'রে চলেছে, সে বুঝতে পারে। সতর্ক হ'লেও খোকার চোখের ভাষা এই মুহূর্তে তার কাছে জটিল কুহেলিকাচ্ছন্ন মনে হয়।

'হিটলারের সেই রাইখস্ট্যাগ জ্বালিয়ে দেবার কথা মনে আছে, নিজেকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করার জন্যে এটা তার পক্ষে অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছিলো সেদিন।' একটু থেমে মুরাদ বললে, 'যে সব দুর্ঘটনা ঘটছে তার সবকিছুর পিছনে একটা অদৃশ্য লোমশ হাত রয়েছে, যে হাতে মদ আর বারুদের গন্ধ। লুটপাট আর আগুন ঠেকাতে গিয়ে আমি কম লোকের মাথা ফাটতে দেখিনি। এখন এমন একজনও মানুষ পাবি না সে ছেলেই হোক বুড়োই হোক শ্রমিক হোক, যা-ই হোক না কেন, যে সজাগ নয় সতর্ক নয়। তুই-ই বল না, এদেশের মানুষের এত তাড়াতাড়ি আর এমন সর্বগ্রাসীভাবে আত্মোপলব্ধি ঘটবে তুই নিজেও কি কখনো ভাবতে পেরেছিলি? এর আগে আর কখনো আমরা এমনভাবে একাত্মতা অনুভব করিনি। সারা দেশের মানুষ আশ্চর্যভাবে এক হ'য়ে গিয়েছে। যারা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায় তাদের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে একতার এই দুর্ভেদ্য দুর্গটিকে গুঁড়িয়ে দেবার। ওরা সব সময় এমন সব বানোয়াট পরিস্থিতি তৈরি করতে সচেষ্ট থাকবে যা ওদের আঘাত হানার জঘন্য ব্যাপারটাকে যৌক্তিক ক'রে তুলতে সাহায্য করবে। একটা বছর ধ'রে এই যে সমানে 'ইয়াহিয়া ইয়াহিয়া-সাবধান সাবধান' এর স্রোত চলছে এটা যে নিছক একটা শ্লোগান নয়, ওরা তা খুব ভালো ক'রেই জানে। যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল, এই আরকি ; কেবলমাত্র নিজেদের তৈরি ক'রে নিতে যে সময়টুকু লাগে। সময় আর সুযোগ অনুকূলে এলেই হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ইয়াসিন বললে, 'আসলে আমাদের চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে। যার মুখে যা শুনছি, তাই বলছি—'

খোকা নিস্পৃহকণ্ঠে মুরাদকে জিগেশ করলে, 'ধর সব দাবী যদি মেনে নেয়?'

'নিতেই পারে না—' জোর দিয়ে মুরাদ বললে, 'বললাম না, সব ঘটনার মুখ একই দিকে! এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তোর

কি মনে হয় যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো হিশেবী বুদ্ধি ওদের মাথায় ছিটেফোটাও আছে? রাজনীতির নামে এতদিন প্রাসাদের অন্ধকারে ষড়যন্ত্র চালিয়ে নিজেদের মগজে যা ছিলো তা-ও গাবিয়ে ফেলেছে; দেশীয় কুইসলিংরাও চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেছে! আমি ব'লে রাখলাম, তুই দেখে নিস, সব শালার পতন হবে, কোনো শালা টিকবেনা। এ হ'লো বর্ণমালার ইন্দ্রজাল। আয়ুব খান থেকে এর শুরু, আমরা যাকে বলি সামরিক শাসন, কখনো নির্বাচনের মুখোশ এঁটে, কখনো গামছা ফেলে একেবারে বাবা আদমের মতো ন্যাংটো হ'য়ে। কিন্তু মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এ থেকে যে ভূতুড়ে যজ্ঞের শুরু তা ওয়াই তে এসে ঠেকেছে, এরপর জেড, চীনা জুতার সুখতলা জুলফিকার আলী, ব্যাস্, তোর ওই খেল খতম, পয়সা হজম, এ-ইইই গানের বই গানের বই!'

খোকা কোনো কথা বললে না। চুপচাপ তাকিয়ে রইলো ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে।

পানির উপরে হাওয়ার নাচন শুরু হয়েছে। বাংলা কবিতার একটি বিড়াল অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে কুড়িয়ে আনছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর 'চল নামি আষাঢ় আসিয়াছে' ধরনের ঝাঁপ দিয়ে উদ্যানের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছোটাছুটি ক'রে নৃত্যরত জিপসী তা কুড়িয়ে নিচ্ছে, যেন শিলকুড়ুনি শৈশব। শৈশব জীবনে বারবার আসে না কেন? আসলে জীবন মানেই শৈশব; জীবনভর মানুষ এই একটা ঐশ্বর্যই ভাঙিয়ে খায়, আর কোনো পুঁজিপাট্টা নেই তার। এই এক অদ্ভুত জীব, ধাপে ধাপে এরা নিজেদের ছোট ক'রে তোলে, রক্তে মিশে আছে এদের নিজেদের পতন।

ইয়াসিন-ও এক সময় উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'মধ্যে থেকে আমার বিয়েটা পিছিয়ে গেল, গুলি মারি শালার আন্দোলনে। দেশের লোক আর সময় পেলে না ম্যাণ্ডেট দেবার, চলি!'

এইসব ভূত যেন কখনো আমার কাঁধে ভর না ক'রে, খোকা ভবিষ্যতের প্লীন্থ গাড়তে থাকে মনে মনে ; ভিতরে যে ভুড়ভুড়ে পাঁক আর গরল জমে আছে খোকার ইচ্ছে নয় তা ঘাঁটাঘাঁটি করার। মিস্ট্রেস রাখলে কেমন হয়। জঁা পল সার্ত্র আর সাইমন দ্য ব্যভেয়ার আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু ফরাসী মেজাজ তো আর আমানি খেয়ে খেত চ'ষে আর পাট জাগ দিয়ে ধার পাওয়া সম্ভব নয়, আমরা সবাই এক একটা ভোঁদড়, ভূষিমাল, একুশে ফেব্রুয়ারি ভেঙে খাচ্ছি এখনো ; গোটা দেশ কলের লাঙ্গল দিয়ে চ'ষে বেড়ালেও একজন বিদগ্ধ মানুষ খুঁজে বের করা যাবে না, হুব্বা, গেঁড়ে, সবকটা দিকপালই এক একটা আনকুথ, এক একটা গাঁইগুঁই, গুফি !

দ্য এসিয়েঁৎ এর বৈদগ্ধ চাই, চোখ চাই এর্নস্ট্-এর। ফাঁক পেলেই ঝি চাকরানিকে পটাপাট বিয়ে ক'রে ফেলা মেজাজ আমাদের। বড় বড় 'পার্টিতে' স্যুটবুটওয়ালারা ট্যারা চোখে ঘ্যাঁসঘ্যাঁস ক'রে পাছা চুলকায় আর শব্দ ক'রে ঢেকুর তোলে এখনো। নাজ সিনেমায় খেলে যাওয়া রঙীন মলটের বই কিনে বাঁশের বক কক্সবাজারি ঝিনুক শামুক আর প্লাসটিকের খেলনার সঙ্গে সাজিয়ে রাখে ড্রইংরুমে ঘটা ক'রে। গোটা দেশের মানুষজনই এক একটা ভূষিমাল, যে যার লাইনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের পাউডার মুছছে আর পিচ পিচ ক'রে পানের পিক ফেলছে, গুফি ! গুফি !

মুরাদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে নীরবে। ভালো লাগে না খোকার। তার চোখ একটা পলকা প্রজাপতির মতো এখানে ওখানে উড়ে বেড়ায়, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, স্বপ্নের গর্ভকেশরে ঃ

সবকিছুই একটা স্বপ্ন। স্বপ্নের ভিতরে আমরা জন্মাই, স্বপ্নের ভিতরে আমরা চিৎকার ক'রে উঠি, ঝনঝন ভেঙে যায় সব কাঁচ, তির তির ক'রে কেঁপে ওঠে দুধের সর, কৌমার্যের পাতলা পর্দা। স্বপ্নের ভিতরে আমরা স্তন্যপান করি, স্বপ্নের ভিতরে আমরা শিল

কুড়াই, স্বপ্নের ভিতরে আমার বকুল ফুলের মালা গাঁথি, স্বপ্নের ভিতরে অঞ্জু পুকুরে প'ড়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে মঞ্জু তাকে ধরতে যায়, স্বপ্নের ভিতরে নীলাভাবী কাঁচের চুড়ির শোকেস হ'য়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে রাজীব ভাই বৈদূর্য-বিদ্রুম হাতড়ায়, স্বপ্নের ভিতরে ফিয়াট ঝড় হ'য়ে ওড়ে, স্বপ্নের ভিতরে বেলী ব্লাউস ছিঁড়ে ফ্যালে, স্বপ্নের ভিতরে লিপস্টিক জড় হয়, স্বপ্নের ভিতরে লুলু চৌধুরী কান ধ'রে টানে, স্বপ্নের ভিতরে মোদিল্লিয়ানী রঙ ছুড়ে দেয়, স্বপ্নের ভিতরে অর্ধেন্দু মুখ পুড়িয়ে ফেলে, স্বপ্নের ভিতরে মতিয়ুর শালিক হ'য়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে প্রীতি বিষ গলায় ঢালে, স্বপ্নের ভিতরে হাইপোস্টাইল হল ভেঙে পড়ে, স্বপ্নের ভিতরে পার্থেনন গমগম ক'রে বাজে, স্বপ্নের ভিতরে পাপ পুণ্য হ'য়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে আত্তিলা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে, স্বপ্নের ভিতরে অন্ধকার হড়াম ক'রে ওঠে, স্বপ্নের ভিতরে দেখতে দেখতে আমরা আরেক স্বপ্ন হ'য়ে যাই।

এইসব মনে হয় খোকার।

কাঁচের একটি বিশাল স্বচ্ছ গোলাকার চিমনির ভিতর মাছির মতো বারবার পিনপিন ক'রে ঘুরতে থাকে এইসব স্বপ্ন।

খুব কাছে, লেকের কোল ঘেঁষে কয়েকটি সাদা রাজহাঁস; খোকার মনে হয় স্বপ্ন। কালো বরফ, নীল চাঁদ, সবুজ সূর্য, রক্তবৃষ্টি, মাংসবৃষ্টি—এক একটি রাজহাঁস। স্তন, শিল, পুকুর, কাঁচের শোকেস, বিদ্রুম, ছেঁড়া ব্লাউস, লিপস্টিক, বিষ, শালিক, হাইপোস্টাইল হল, সবকিছু রাজহাঁসের একটি পালক।

খোকা এমনভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে যাতে একটি সিগ্রেটের পুরোটাই আঙ্গুলের ফাঁকে নিঃশব্দে পুড়ে যায়।

আমিও একটা স্বপ্ন—স্বস্তিকা, ক্রস আর সুলেমানের তারকার মতো আমিও একটা স্বপ্ন, খোকার মনে হয়, সুরক্ষিত অতীত আর

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝখানে ঝুলন্ত এক সেতুর উপর কুটকুটে ন্যাতাজড়ানো ফ্যাল্‌না ছেলের মতো সর্বক্ষণ কি খেলায় যে বিভোর!

'মুরাদ তুই লা হোর্লা পড়েছিস?'

'পড়িনি, কেন বলতো?'

'এমনি-ই! আমার ঘরে আছে, প'ড়ে দেখিস। আজ ক'দিন থেকে মনের ভেতর কেবল লা-হোর্লা লা-হোর্লা চলছে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না!'

'মাঝে মাঝে এমন সব উদ্ভট কথা বলিস!'

'তোর ধারণাটাই বোধ হয় ঠিক, ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে এবার!'

'ধানঝাড়া করবে, এই আর কি!' মুরাদ হেসে বললে।

'আরো অনেক বেশী। হয়তো আমরা কেউ থাকবো না; স্বপ্ন হ'য়ে যাবো—'

মুরাদ অকারণে হাসতে থাকে। বললে, 'তুই কোন্‌টা চাস? সাত কোটি লোক মারা যাক, শুধু আমরা কয়েকজন বেঁচে থাকি, না আমরা এই ক'জন শুধু মারা যাই, সাত কোটি লোক অক্ষত থাকুক, কোনটা?'

'দুত্তোর কোনোটাই না!'

মুরাদ একটু থেমে কিছু একটা ভাবলো। একটা সিগ্রেট ধরালো। বললে, 'আর একটা ইন্দোনেশিয়া হ'তে চলেছে দেশটা—'

'তোর একটা গুণ আছে মুরাদ, সবকিছু তুই খুব সহজভাবে নিতে পারিস। ভিতরে ভিতরে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে যাচ্ছে—'

'গুণটুন বুঝিনা—' চটাস করে সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে মুরাদ বললে, 'গতানুগতিকতাকে আমি ঘৃণা করি! পরিবর্তন চাই। এমন একটা পরিবর্তন যা সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ ক'রে দেবে, বদলে দেবে। মানুষ আর স্রোতের শ্যাওলায় কোনো তফাৎ নেই এখন, এটা

ঘৃণ্য। শিরদাঁড়াকে এমনভাবে বেঁকিয়ে রেখেছি যা লাথি না খেলে কখনো সোজা হবে না। মার চাই আমাদের, শয়তানের মার।'

'তার মানে সাপের মতো খোলস বদল ক'রে আমরাও বারবার নতুন হ'তে চাই!'

'সাপের মতো কিনা জানিনা—' মুখ অপেক্ষাকৃত শক্ত ক'রে মুরাদ বললে, 'তবে পরিবর্তন আমরা চাই, আর এইজন্যেই আমরা মানুষ। পরিবর্তন থেকে পরিবর্ধন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নিত্য নতুন চিন্তা করার একটা ঐতিহ্য রয়ে গিয়েছে বাঙালীদের; আমরা এই বাঙালরা তুচ্ছ হেলাফেলার জিনিস নই!'

'পরিবর্তন আর রূপান্তরের তফাৎ বুঝিস?'

'কি রকম?' চোখ কোঁচকায় মুরাদ।

'তার মানে পরিবর্তমান সমাজের মানুষরা তোর কাছে সন্দেহের পাত্র। গদী আঁকড়ে থাকা ক্ষমতালোভীদের মতোই নিছক মাছ ধরার জন্যে পানি ঘোলা করছিস তুই। কতেগুলো বাতিক আছে তোর, দুঃস্বপ্নের নরকে হাবুডুবু খাওয়ার অভ্যেসটা মজ্জাগত দোষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!'

'তুই শুধু চোখ দিয়ে দেখছিস কেন সবকিছু—'

'তুই দেখছিস কান দিয়ে—'

খোকা অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'তোর কি কখনো এইসব দুমদুমারি হট্টগোল দেখে অন্য কোনো কথা মনে আসে না? ওদের সঙ্গে আমাদের তফাতটা তাহলে রইলো কোথায়? তফাতটুকু কি তাহলে এইটুকুই—ওদের গায়ে খাকি পোশাক আমাদের গায়ে গামছা, ওদের পায়ে বুটজুতা আমাদের পায়ে চটি, ওদের কাঁধে অটোম্যাটিক রাইফেল, আমাদের কাঁধে স্কুলের বই! তফাতটা যদি কেবলমাত্র এইটুকু হয়, তার মানে এ-ও দাঁড়ায়, প্রয়োজন হ'লে আমরা খাকি

পোশাক পরবো, রাইফেল কাঁধে নেবো। কিন্তু খুব ভালো ক'রে খতিয়ে দেখলে ধরা যাবে ওরা যা, আসলেই আমরা তা নই। ওরা যা পারে আমরা তা পারি না। আমাদের তা পারা উচিত নয়। আমি পাঞ্জাবী সোলজারদের মতো হ'তে ভালবাসি—এ জাতীয় কথা উঠলেও ঘৃণায় শিউরে উঠবো আমরা! কিন্তু কেন? গুণ্ডামি পাণ্ডামি লুট হত্যা ধর্ষণের জাতীয় চরিত্র নেই ব'লে? ঠিক তা নয়; হয়তো উল্টোটা ব'লেই। আমরা মানুষ, হৃদয়হীন, চিন্তাশক্তিহীন রোবট নই; তুই আমার কথা শুনছিস?'

'শুনছি!' মুরাদ মাথা নেড়ে বললে, 'আমরা যে কি মাল প্রত্যেকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই তা ব'লে দেবে—'

খোকা মুরাদের কথার ধার দিয়েও গেল না।

সে বললে, 'আমরা কি বলি? বলি পশুশক্তি! ওরা এক একটা জানোয়ার। আধা জানোয়ার থেকে এক লাফে পুরোপুরি জানোয়ার হওয়াটা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়, বরং সেটাই সহজ। আমরা এই আধা জানোয়ারের দল সব সময় পুরোপুরি জানোয়ার হ'য়ে ওঠার জন্যে উদগ্রীব থাকি, প্যাচপেচে পরিবেশ দলদলে পরিস্থিতি এসব খুঁজি, সুযোগ পেলেই গর্জন ক'রে জাহির করতে চাই সেই পশুত্বকে। কিন্তু আমি বলছি ওরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে এক একটি রোবট, নিছক পশু নয়। প্রয়োজনের খাতিরে আধা জানোয়ার থেকে পুরোপুরি জানোয়ার হ'তে পারি, কিন্তু বল, রোবট হ'তে পারবি, চিন্তা করতে পারিস তুই?'

'বরং তুই থাম খোকা। এখনই আমার গা ছমছম করছে। গ্লাসে ঢেলে যা গেলা যায়, তোর অভ্যেস মড়ার মাথার খুলিতে ঢেলে তা গেলা। তুই শালা বুজিংগো দলের পাণ্ডা; এক কাপ চা-কে ইচ্ছে ক'রে হেমলক বানিয়ে ফেলিস!'

'আমি কি খুব বাজে কথা বলছি?'

'প্যাঁচ মারাটা তোর চিরকেলে স্বভাব। আন্দোলন ইজ আন্দোলন—' খুব জোর দিয়ে মুরাদ বললে, 'রোবট আবার কি? আগেও বহুবার তুলেছিস কথাটা, আধুনিক মানুষ তোর কাছে নিছক রোবট।'

বাধা দিয়ে খোকা বললে, 'রবার্টসনের টিটানের কথা তোর মনে আছে? তুই কি মনে করিস নিছক সাইন্স ফিকশন? তাহলে টাইটানিকটা কি?'

মুরাদ বললে, 'এখানে যা কিছু ঘটছে, কিংবা ঘটতে চলেছে, সেটা অভাবনীয় কিছু নয়, ইতিহাসের নিয়মেই তা হচ্ছে। বুজরুকি মেরে ধাপ্পা দিয়ে জনতার রুদ্ররোষকে ধামাচাপা দেওয়া এখন অসম্ভব। আজকের পৃথিবীর স্বাধিকার প্রমত্ত বলবান মানুষ তার দৃষ্টিকে আর আচ্ছন্ন রাখতে চায় না; তারা সদা সতর্ক। স্বাধিকারকে যা খর্ব করবে, নস্যাৎ ক'রে দেবে, এমন সবকিছুর উপরই তারা আঘাত হানতে বদ্ধপরিকর!'

'এসব ডাস্টবিনের কথা! বছরের পর বছর ওই একই গতে কথা ব'লে যাবি তোরা, তবু যাহোক ল্যাটিন আমেরিকার কথা ওঠেনি। তোর কথায় আজকের পৃথিবীর স্বাধিকারপ্রমত্ত মানুষের যে ছবিটা ফুটে উঠেছে তাতে তুড়িলাফ দেবার মতো তেমন কিছু নেই। খবরের কাগজের মাস-মাইনের রিপোর্টার কিংবা পেশাদার ভাড়াটে নেতাদের মতোই দায়সারা গোছের একটা চেহারা আঁকলি তুই। আজকের পৃথিবীর মানুষ বলতে গিয়ে তুই কিছু সংখ্যক মানুষকে একফালি তরমুজের মতো আলাদা ক'রে ফেলতে চাস। তার মানে গতকালকের পৃথিবীতে যে মানুষ ছিলো তাদের সঙ্গে এদের ঘোরতর প্রভেদ ধরতে পারছিস তুই। গতকালকের পৃথিবী সম্পর্কে তোর মনে নিশ্চয়ই কোনো স্বচ্ছ ধারণা জন্মেছে, তা না হ'লে ওই টনটনে ভেদজ্ঞানটা আসছে কোত্থেকে। এখন আমাকে বুঝিয়ে বল,

গতকালকের সেই মানুষ সম্পর্কে তোর যাবতীয় ধারণার মূলসত্য কোনটি, না কি ওটা এমনি-ই কথার কথা?'

'তার মানে তুই আমাকে ভূতের ভয় দেখাবি এখন, এই তো? খচড়ামিটা তোর আজন্মকালের ঘোড়ারোগ। সব কথা বুঝেও না বোঝার ভান ক'রে আমার কাঁধে গায়ের জোরে একটা মত চাপাতে চাচ্ছিস তুই!'

'চোখের পলক পড়তে না পড়তে পাঁচশো টনের একটা কোবাল্ট বম গোটা পৃথিবীকে হিরোশিমা ক'রে ছাড়তে পারে ব'লে মানুষকে আমরা আজকের মানুষ হিশেবে যেমন চিহ্ন দিতে পারি না, ঠিক তেমনি রাশিয়ার নিপীড়িত জনগণ জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছে ব'লে তাদেরও আমরা আজকের মূর্তিমান মানুষ বলে আখ্যা দেবো না। এই মুহূর্তে তুই আর আমি রমনা রেস্তোঁরায় ব'সে যাকে আজ ব'লে আখ্যায়িত করছি, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তা গতকাল হ'য়ে যাবে। গতকাল আজ আগামীকাল এগুলোর ঠুনকো আপেক্ষিকতাকে তুই নিশ্চয়ই স্বীকার করিস। কিন্তু মানুষ, যখন আকাশে তারার অভ্যুদয় ঘটেনি তখনকারও এক সভ্যতার কথা আমরা শুনে থাকি, টিটিকাকা হ্রদের কোলে টিয়াহুয়ানাকোর সভ্যতা এই ধরনের প্রাচীন। গতকালকের মানুষ আর আজকের মানুষ ব'লে কোনো কথা নেই। টিয়াহুয়ানাকোর মানুষও যা, থাটমোসের মিশরীয়রাও তাই। কখনো সিজারকে সে হাতের স্টাইলাসে কুপোকাত করছে, কখনো সিংহের চামড়া পরে যোদ্ধার বেশে বাদর নাচ নাচছে মোজাম্বিকে। প্রত্যেকেই মানুষ। দলাক্রোয়াও মানুষ ছিলো, শাগালও মানুষ, রশিদ চৌধুরীও মানুষ। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ কিংবা বিনয় মজুমদারের সঙ্গে বংগো বাজানো প্রাদোর আমি কোনো তফাৎ দেখি না। লা-হোর্লা লেখা মোঁপাসার সঙ্গে একজন ভুডো এক্সপার্টের আদতেই কোনো প্রভেদ নেই। সবক্ষেত্রেই ওই একই

কথা, মানুষ। পাঁচশো টনের কোবাল্ট বম ঝাড়তে পারিস ব'লে, কিংবা লংমার্চ করতে পারিস ব'লে তুই মুরাদ চৌধুরী কিংবা শেখ মুজিবর রহমান মওলানা ভাসানী আজকের মানুষ হ'তে পারিস না। মানুষ পিরামিড গড়েছিলো, মানুষ কলোশিয়াম নির্মাণ করেছিলো; বাগদাদের ইলেকট্রিক ব্যাটারির কথা শুনিসনি!'

'এখন দয়া ক'রে কিছুক্ষণের জন্যে তোর ওই ব্যাটারিটাকে তুলে রাখ, এসব ফালতু কথা ঘাঁটাঘাঁটির কোনো মানে হয় না। তুই ঘরের দরোজা বন্ধ ক'রে ভুডো প্রাকটিস কর, আমাকে ওর ভিতর জড়াসনে। তোর লাইন আলাদা। তুই শালা ডাক্তারকে বলিস ম্যাজিশিয়ান, ভ্যালিয়মকে বলিস মাদুলি, অক্সিজেনকে বলিস ঝাড়ফুঁক। আমার স্পষ্ট মনে আছে এখনো গত বছর স্যালাইনকে অক্ষতযোনী ষোড়শীর টাটকা পেচ্ছাব বলায় হাসপাতালের ডাক্তাররা তেড়ে এসেছিলো তোকে মারতে।'

'কথাটা ঘুরিয়ে দিলি তো? ভালোই করেছিস—'

'এই রোবটের কথা শুনলেই আমার গা শিরশির করে। যে কথার জন্যে এসেছিলাম এখানে, তা আর বলা হবে না আজ।'

'কি বলতে চেয়েছিলি?'

'না আজ থাক। এখন আর ভালো লাগছে না। এখানে সে রকম পরিবেশ নেই। পচা নালী ঘা-র মতো থুকথুক করছে, অন্য কোথাও বসা উচিত ছিলো আমাদের—'

'পরিবেশ-টরিবেশও আছে এর মধ্যে, ব্যাপার কি?'

'দোহাই তোর, জোর করিস না—' অসহায় ভঙ্গিতে মুরাদ বললে, 'আজ আর কিছু ভালো লাগছে না!'

'তুই আমার রাত্রির ঘুম নষ্ট করছিস!'

'তোর তো রাত্রে ঘুমই হয় না—'

'খচড়ামি রেখে কি বলতে চেয়েছিলি বল, ভনিতার কি দরকার।'

'তুই আমাকে জোর করছিস, কিন্তু আমি জানি শুনলে তোর মন খারাপ হ'য়ে যাবে। তবু তোকে বলা দরকার, সেই জন্যেই যেতে চাচ্ছিলাম তোর কাছে।'

'বুঝলাম তো, তারপর?' খোকা বড় বড় চোখে মুরাদের দিকে তাকালো। অবসন্ন মনে হয় মুরাদকে; মানসিক শ্রান্তিতে একটু একটু ক'রে ভেঙে পড়ছে সে।

'তোর মন খারাপ হ'য়ে যাবে খোকা, বরং শুনে কাজ নেই—'

'প্যানপ্যানানি রেখে খুলে বল যা বলার।'

'কথা দে, সব শুনে আমাকে ঘৃণা করবি না!'

'ব্যাপার কি, সিফিলিস নাকি?'

'কি যা-তা বলছিস!'

'সিফিলিস যা-তা ব্যাপার হ'লো? বোদলেয়রের ছিলো না?'

'আমি তো আর বোদলেয়র নই।'

'হ'তে কতোক্ষণ! এই যে এতো ভ্যারেণ্ডা ভাজলাম তাতে-ও কি তুই বুঝতে পারিসনি যে বোদলেয়রের সঙ্গে আদতেই তোর কোনো তফাত নেই। আর এভাবে যদি দেখতে কষ্ট হয় তাহলে খোলা চোখেও মিল খুঁজে পাবি। এটা বরং তোর পক্ষে আরো সহজ। বোদলেয়র যা যা করতো তুই-ও তাই করিস। তুই কবিতা লিখিস, দু'একবার পাড়ায় গিয়েছিস, ড্রিংক করিস, অনুবাদেও হাত দিয়েছিস। বোদলেয়রের মতো তোর শুধু লেপ্টে থাকা ধুমসো ভেনাস নেই, যে তোকে ফতুর ক'রে ছাড়বে। তা ওটা তুই নিজেই ম্যানেজ ক'রে নিতে পারবি, সে গুণ তোর আছে। আজকাল তোর যে চাল চলন দেখছি তাতে বুঝতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় না ঐসব জিনিস লটকাবার জন্যে দিনরাত হন্যের মতো ঘুরছিস তুই। চেহারাটাও মালখোর মালখোর টাইপের হ'য়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। তা জুটিয়েছিস নাকি এক আধটা ঢাউস জিনিস? তোর তো আবার গন্দ্‌-জমার্কা পেল্লায়

পেল্লায় জিনিসের খায়েশ হয় ; নৌকোর দুলুনিতে গা গোলায়, চিরকালই তুই ইস্টিমারে চাপা পছন্দ করিস। কিবে, হুব্বার মতো জিভ কামড়ে ব'সে আছিস কেন, মাল ছাড় ! মাল ছাড় !'

মুরাদ কোনো কথা বললে না। খোকার দিকে মোমের মতো অদ্ভুত এক থির দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে রইলো। এই মুহূর্তে সে ব'সে আছে এক অচেনা ব্যাধের সামনে ; মুখ দেখে মনে হয় তার হাত-পা প'ড়ে গিয়েছে, নিজেই নিজের ভার রাখতে অক্ষম এখন।

'কি বলবি বল ?'

'আমি জানি, তোর শোনার ইচ্ছে নেই—'

'ঘণ্টা জানিস তুই !'

'ভালো লাগছে না কিছু, চল ওঠা যাক, বেশ রাত হয়েছে। রঞ্জু তোর জন্যে দুশ্চিন্তা করবে।'

জটিল ব্যবধান ক্রমশ দুস্তর হয় দু'জনের মাঝখানে, সেখানে টেবিলের পিঠ, এ্যাসট্রে, চায়ের কাপ, সিগ্রেটের প্যাকেট, সবকিছুই অপসৃত ! দু'জনের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে প'ড়ে আছে একটি ঠাণ্ডা-হিম তরোয়াল।

বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো খোকা। রিকশায় ওঠার আগে পর্যন্ত কোনো কথা বললো না মুরাদ। নিঃশব্দে হাঁটলো। খোকা একা হাত-পা নেড়ে অনর্গল কথা বলতে লাগলো। এমনভাবে হাত পা নাড়ছিলো যে এই অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে এ কথাই ভাবতো, একটি পাগল অন্ধকারের সঙ্গে পিংপং খেলায় মেতে উঠেছে।

'চলি দেখা হবে—' রিকশায় উঠতে উঠতে মুরাদ বললে।

রিকশায় উঠলো খোকাও। ছাউনি নামিয়ে দিলো মাথার। চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঝিঁঝিপোকার ঐকতান ; রাত্রি হ'য়ে আছে বহুকাল আগে ডুবে যাওয়া টাইটানিক, এ্যাঞ্জেলফিশের ক্ষীণ নিশ্বাস তার গায় দাগ কাটতে পারে না , রঞ্জুকে ভালোবাসে মুরাদ, আর

রঞ্জু, ভালবাসার ভ-ও বোঝেনা, বেচারী, নিজের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর হঠাৎ হোহো ক'রে হেসে ফেললে খোকা, 'রাক্ষস !'

+

ঘুম জড়ানো আধবোঁজা চোখ ডলতে ডলতে দরোজা খুলে দেয় লেবু।

'ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে চিল্লাচিল্লি করছি, কানে তুলো এঁটেছিলি নাকি, অপদার্থ কোথাকার !'

ঘরে ঢুকেই লেবুকে একচোট ধমকালো খোকা। উত্তর না দিয়ে ঘাড় নিচু ক'রে-থাকলো লেবু। ঘরদোর সব ফাঁকা ফাঁকা, থমকানো, কিছু একটা ঘটেছে, উসখুস করতে থাকে খোকা।

আলো জ্বালালো খুট ক'রে।

'রঞ্জু', এই রঞ্জু !'

কোনো উত্তর নেই !

'রঞ্জু তুই খেয়েছিস ?'

আগের মতোই কোনো সাড়া না পেয়ে বিছানার দিকে এগোয় খোকা। খাটের উপর ঝুঁকে বললে, 'কি রে, ঘুমের ওষুধ গিলেছিস নাকি, এই রঞ্জু !'

বোঝা গেল জেগে আছে সে। খোকার দিকে পিঠ দিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

'ঠ্যালা সামলাও এখন ! কি রে, গোঁসাঘরে গিয়ে খিল দিয়েছিস নাকি ? একবাটি তেল লাগবে ?'

এবার-ও কোনো উত্তর পেল না খোকা। এতে কিছুটা অবাকই হয় সে। সাধারণত এ ধরনের একগুয়েমি করে না রঞ্জু ; গোঁ ধ'রে ব'সে থাকা কাকে বলে জানে না বললেই হয়, খোকা নিজেই বরং কিছুটা ঘাড়গোঁজা স্বভাবের।

‘এই আহ্লাদী !’

পকেট থেকে চটকানো রুমাল বের ক’রে রঞ্জুর মুখের উপর ছুড়ে দিলো খোকা।

‘এই পান্তাবুড়ি, কি হয়েছে কি তোর ? ওঠনা, বেশী আদিখ্যেতা করলে গায়ে পানি ঢেলে দেবো !’

হঠাৎ মনে হ’লো খোকার দাঁতে দাঁত চেপে ঢোক গিলে গিলে রঞ্জু কাঁদছে ।

‘লেবু, একটা লগি নিয়ে আয়, ওকে আমপাড়া করবো—’

শেষে বিছানায় হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে গেল। হাত ধ’রে টেনে ঘুরিয়ে দিলো। সত্যিই গুমরে গুমরে কাঁদছে রঞ্জু।

‘খেয়েছে রে ! এইনে, কানমলা খাচ্ছি, আর রাত করবো না কখনো, ঘাট মানছি, আচ্ছা ডাব্বু তো ! বুদ্দুর মতো কাঁদছিস কেন, এই বুড়ি !’

খোকা ওর গালে হাত বুলিয়ে দিলো ! চোখের পানিতে ভিজে গেল হাত। হেসে আঙ্গুলের ডগা জিভে ছুঁইয়ে টকাশ ক’রে একটা শব্দ তুলে সে বললে, ‘না তেমন নোনতা নয়, ফিকে হ’য়ে এসেছে নুনটা ; তার মানে অনেকক্ষণ ধ’রে কাঁদছিস। বালিশটাও ভিজিয়ে ফেলেছিস। বালিশে দানা লাগিয়েছিস নাকি, চারা তুলবি ?’

বালিশে চোখ-মুখ ড’লে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো রঞ্জু।

খোকা বললে, ‘বুঝলাম, আমার চেয়ে দেয়ালটাই তোর কাছে ভালো এখন। ঠিক হ্যায়, এখন থেকে ওটাকেই দাদা ব’লে ডাকিস।’

‘সিদ্ধেশ্বরী থেকে চাচা এসেছিলেন, সাড়ে নটা পর্যন্ত ছিলেন, জরুরী কথা আছে। কালকেই দেখা করতে বলেছেন—’

‘গুলিমার !’

‘বারবার বলেছেন, কালই যেতে ; খুব চ’টে গিয়েছেন তোর ওপর।’

'খুব চোটপাট করেছে তাহলে ?'

'আমরা বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো কিনা জানতে এসেছিলেন, সবাইকে দেশে পাঠাচ্ছেন। আমাদেরও যেতে বলছেন সঙ্গে।'

'যতোসব গুবলেটমার্কা কথা। বাড়ি ফেলে রেখে যাই, আর সবকিছু লুটপাট হ'য়ে যাক, ভালো করতে পারিনা মন্দ করতে পারি, কি দিবি তা বল্!'

'সেজখালাও এসেছিলেন—'

'বলিস কি! কতোক্ষণ ছিলো ?'

'দুপুর থেকেই ছিলেন, সন্ধ্যার একটু আগেই চ'লে গেলেন। তুই যাসনে কেন ?'

'বললো বুঝি ?'

'কতো কান্নাকাটি করলেন। শিগগির কুমিল্লায় চ'লে যাচ্ছেন সবাই, শুধু সেজখালু থাকবেন। আমাদের যেতে বলেছেন ওঁদের সঙ্গে।'

'হুঁ! সঙ্গে নিশ্চয়ই বেলী ছিলো, না থেকে ভালোই হয়েছে, বেলীটা একেবারে অসহ্য আমার কাছে।'

'থেকে যেতে চেয়েছিলো, সেজখালা রাজি হলেন না, বললেন আমি একা একা ফিরতে পারবো না, অন্যদিন আসিস—'

'পরে শোনা যাবে সব, এখন ওঠ দেখি। হাবার মতো এ্যাঁয়ু এ্যাঁয়ু ক'রে কাঁদছিলি কেন ?'

'এমনিই।'

'এমনিই আবার কেউ কাঁদে নাকি ?'

'আমি এমনিই কাঁদি—'

'তার মানে তোর ট্রিটমেন্ট দরকার। তোর কানে গরম রসুনতেল ঢালা দরকার; নির্ঘাত একটা ইস্কুরুপ ঢিলে হ'য়ে গিয়েছে তোর মাথার ভিতর। দেরি ক'রে ফিরেছি ব'লে কাঁদছিলি ?'

'বাপির জন্যে মন কেমন করছিলো।'

'এটা তোর বাড়াবাড়ি। তারিখ এসেছে যে হাপুস নয়নে কান্না জুড়বি?'

'যদি না আসতে পারে?'

'যদি আবার কি এ্যাঁ? তোর যতো উড়ো বায়নাক্কা। খামোখা মন খারাপ করাটা ধাত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নেমে চল, দারুণ খিদে পেয়েছে, পেট চুঁইচুঁই করছে। দুপুরের মাছ রেখেছিস তো, কি মাছ?'

'পাবদা!'

'পাবলো নেরুদা—গুড!'

দু'জনে একসঙ্গে খেলো। পরে একসময় রঞ্জু বললে, 'তুই একটা আজব মানুষ, এতোক্ষণ কিছুই নজরে পড়েনি তোর, আশ্চর্য!'

'কেন, কি হ'লো আবার?'

'দেখতে পাচ্ছিস না কিছু?'

'কি জানি বাবা—'

'ময়নাকে দেখছিস?'

'তাই বল! কি হলো আবার ময়নার? ঠিকই তো, এসে থেকে ওকে দেখিনি। ওর বাবা নিয়ে গেছে বুঝি?'

রঞ্জু বললে, 'ওর বাবা বিকেলের দিকে এসেছিলো ওকে নিতে, কিন্তু পায়নি—'

'পায়নি মানে, কি আবোল তাবোল বকছিস?'

'পায়নি মানে পায়নি! ইচ্ছেমতো তেরিবেরি ক'রে গেল, তুই থাকলে নির্ঘাত হাতাহাতি হ'য়ে যেতো তোর সঙ্গে। লোকটা এমন মুখফোঁড়!'

'তা না হয় হ'লো, কিন্তু ময়নার ব্যাপারটা কি?'

'ময়না চ'লে গেছে!'

'তোকে ব'লে গেছে?'

'হ্যাঁ!'

'কিন্তু এরকম হঠাৎ চ'লে যাবার মানেটা কি? গেলই বা কোথায়?'

'ময়না হাতেম আলীর সঙ্গে গেছে—'

'কি সর্বনাশ! তার মানে ইচ্ছে ক'রেই গেছে। পেটে পেটে এত বজ্জাতি মেনিমুখো ছোকরার! আগে থেকে জানতিস তুই?'

'না! আজকেই শুনলাম সব। হাতেম আলী ওকে বিয়ে করবে। যাবার সময় ব'লে গেছে, ওর কোনো দোষ নেই!'

'তুই যেতে দিলি কেন?'

'দেবো না-ই বা কেন?'

'তুই জানিস হাতেম আলীর মনে কি আছে?'

'হাতেম আলী ওর কাছে অনেকদিন থেকে পয়সা জমায়, ওই জমা পয়সা থেকে কানের দুলও গড়িয়ে দিয়েছে ভিতরে ভিতরে। তেমন তাড়াহুড়ো ছিলো না ওদের, হুট ক'রে ময়নার বাবা এই টানা হ্যাঁচড়া পাকালো ব'লেই—?'

'তবু আস্কারা দিয়ে তুই ভালো করিসনি—'

'ও বুঝি আমার বারণ শুনতো?'

'একশোবার শুনতো। দায়িত্ব আছেনা আমাদের। সব জেনে-শুনে একটা উটকো লোকের সঙ্গে যেতে দিয়ে তুই ভুল করেছিস!'

'ও আমাকে বলতে চায়নি। আবডালে ব'সে ব'সে কাঁদছিলো, ওর প্ল্যান ছিলো না-ব'লে পালানোর। শুধু আমার চাপে প'ড়ে সব স্বীকার ক'রে ফেলেছে!'

'কিন্তু তোর কাজটা হয়েছে বোকার মতো, এদের আস্কারা দিতে নেই; কি থেকে কি দাঁড়ায় তুই কি ক'রে জানবি! কোনো চালচুলো নেই, ঠিক-ঠিকানা নেই, হাতেম আলী যদি ওকে পথে

বসিয়ে দেয় শেষ পর্যন্ত, তখন? সব চাপবে আমাদের কাঁধে। তোর উচিত ছিলো আমার সঙ্গে পরামর্শ করা, মতামত জানা।'

রঞ্জু ক্ষিপ্ত হ'য়ে বললে, 'পাচ্ছি কোথায় তোকে? আমার বারণ শুনতে ওর ব'য়েই গেছে! ও নিজে যদি ভালো মনে ক'রে থাকে আমাদেরই বা অতো মাথাব্যথা কিসের!'

খোকা রঞ্জুর মুখের দিকে তাকালো! একরোখা জেদি ভঙ্গিতে ও পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বললে, 'টাকা-পয়সা নিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমিই চুকিয়ে দিয়েছি, ওর আশিটাকা জমা ছিলো—'

বিরসমুখে গা-হাত-পা ছেড়ে দিয়ে খোকা বললে, 'তাহলে এই ব্যাপার!'

রঞ্জু কোনো কথা বললো না, মাথার বিনুনি খুলে নোতুন ক'রে ক'ষে বাঁধতে বাঁধতে কেবল এক পলকের জন্যে খোকার মুখের দিকে তাকালো।

খোকা বললে, 'মুখ আঁধার ক'রে ব'সে আছিস কেন অমন?'

'তুই-ই বা মিথ্যে মিথ্যে আমার কাঁধে দোষ চাপাচ্ছিস কেন!'

'দোষ দিলাম বুঝি?'

'তবে কি!'

'যাব্বাবা!'

রঞ্জু বললে, 'তুই একটা কাটমোল্লা!'

'তাই বুঝি?'

'হাতেম আলীটা খুব সরল, ওর ভিতরে কোনো প্যাঁচঘোঁচ নেই, বলিসনি আগে? কি এমন দোষ হয় ময়নাকে যদি ও বিয়ে করে? ময়না তো ওকে ভালবাসেই—'

'আরেব্বাপ, ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে তোর উপর। কি ক'রে জানবো তুই এতো বুঝিস?'

'বললাম তো', তুই একটা বুড়ো ভাম।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে খোকা বললে, 'তাহলে সবাই ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছে—'

রঞ্জু কোনো উত্তর দিলোনা।

'তোর কি খুব ভয় লাগছে, সেজখালাদের সঙ্গে যাবি?'

'না।'

'এখানে থেকেই বা কি করবি? এখনই কেমন ভূতুড়ে ভূতুড়ে ঘুটঘুটে হ'য়ে গিয়েছে পাড়াটা, তুই বরং বেলীদের সঙ্গে চ'লেই যা। কোনোদিন বাঁশঝাড় এঁদো পানাপুকুর দেখিসনি, এসব দেখা হবে। কি যেন গ্রামটার নাম, বাঞ্ছারামপুর, তুই যদি মনে মনে কোনো কিছু যাচ্ঞা করিস তা পূর্ণ হবে ওখানে!'

'দরকার হ'লে তুই যা না।'

'আবার খাঁউ! ওখানে গেলে কেউ তোকে গিলে খাবে না।'

'বাপির কথা খেয়াল নেই বুঝি?'

'সে-তো আমি আছিই। দু'জনে মিলে তোর ওখানে হাজির হবো। ব্যাপারটা মন্দ হয়না কিন্তু। এমনিতেও তোর কিছুদিন একলা থাকা দরকার, তখন মর্ম বুঝবি—'

রঞ্জু বললে, 'তুই বরং ওদের সঙ্গে যা, বেলীও খুব খুশি হবে।'

'তাই বল! এতোক্ষণে বুঝলাম তোর গররাজী হওয়ার কারণটা। তুই বুঝি বেলীকে খুব হিংসে করিস?'

'হিংসার কি আছে এতে? বেলীর চিন্তায় দিনরাত যেন আমার ঘুম হচ্ছেনা?'

'ঘুম হচ্ছেনা আমার—'

'বেলীকে দেখলে তো তাই মনে হয়।'

'ওর একটা দস্তুরমতো হাতেম আলী দরকার, বুঝলি না!'

'তোর মুখটা একটা নরদমা।'

'তোর মুখ একটা ফুলের বাগান।'

একটু পরে খোকা বললে, 'বেলীটা নিছক ঝামেলা। আপদটাকে কেন যে বিদায়ের ব্যবস্থা করছে না বুঝিনা। সেজখালার উচিত দড়াম ক'রে ওটাকে বিয়ে দিয়ে পার করা। দাঁড়া, এবারে এলে আমি নিজেই তুলবো—'

'পাত্র দেখে দিতে পারবি?'

'সেটাও একটা কথা। গোল্লায় যাক! বেলীফেলি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোর কোনো লাভ নেই, ওর ইস্কুল আলাদা, কালিকলম বইশ্লেট আলাদা; ওর ব্যাপার তুই বুঝবি না।'

রঞ্জু বললে, 'পাড়ার কতোগুলো ছেলে এসে আজ ঝামেলা বাধিয়েছিলো। আমাদের ছাদে ফ্ল্যাগ নেই, খুব চোটপাট করছিলো ছেলেরা, বলছিলো বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে—'

'যে যার নিজের ছাদে একটা ফ্ল্যাগ ওড়ালেই সব হ'য়ে গেল আরকি! কারা যে এইসব চ্যাংড়াদের বুদ্ধি জোগায়! কি বললি ওদের?'

'দশটাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাগ কিনতে হ'লো ওদের কাছ থেকে। ছাদে উড়িয়ে দিয়েছে লেবু।'

'ঝক্কি চুকেছে। নে, এখন শুয়ে পড়।'

খোকা নিজের ঘরে চ'লে এলো।

চারপাশে বইপত্র ছড়ানো। বিছানার চাদরও এলোমেলো, লণ্ডভণ্ড। এখানে বই, ওখানে খাতা, ঘরে পা দিয়ে একটু অবাকই হ'লো খোকা। ভূতপ্রেতের দল ফাঁকা পেয়ে মনের সাধ মিটিয়ে একচোট নাচানাচি ক'রে গিয়েছে ঘরময়। কেবল দলামোচড়া কতগুলি কাগজ ভাঁজ ক'রে সযত্নে কাটগ্লাসের ভারী এ্যাশট্রেটা চাপা দিয়ে রাখা। একটির পিছনে লেখা 'কেন লেখো, কেনই বা ধ্বংস করো, তুমি কি?'

এক সময় বিছানার চাদর ঠিক করতে গিয়ে বালিশ সরাতেই চোখে পড়ে একটি চারভাঁজের কাগজ :

খুব শিগগির আমরা বাঞ্ছারামপুর যাচ্ছি। তুমি যাবে না? যদি না যাও, হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না। দেখা কোরো, ভয় নেই। তোমার কথা সব সময় মনে হয়। বড় নিষ্ঠুর তুমি। পায়ে পড়ি দেখা কোরো। তোমাকে তো পারেনি, তাই তোমার একলা বিছানাটাকেই এলোমেলো তছনছ ক'রে দিয়ে গেল বেলী।

বেড়ে লিখেছে ছুঁড়ি, বিড়বিড় করতে থাকে খোকা। একলা বিছানা, খাসা খাসা! ভিতরে ভিতরে একেবারে ঝুনো হ'য়ে গিয়েছে, শাঁস বলতে কিছু নেই, সব ফোঁপল হ'য়ে গিয়েছে, ফোঁপল ফোঁপল।

বুকের তলায় বালিশ গুঁজে বারবার উল্টেপাল্টে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো চিঠিটা। খোকা মনে মনে বলতে লাগলো, পেকে গিয়েছে, বোঁটার গোড়া পর্যন্ত পেকে গিয়েছে এ মেয়ে। কায়দাটা ভালোই রপ্ত করেছে, 'তোমাকে তো পারেনি' রক্ষে করো, না, গুণ আছে ওর, ওর লাইনে ও ডিগ্রী নেবার মতোই; এইজন্যই লতানো ঝুলপি ভোগলা পায়জামা আর ধনুকমার্কারা ওর পিছনে কামড়ি খেয়ে লেগে থাকে। সত্যি, গুণ আছে ওর। প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, একটাই ওর চিন্তা, একটাই ওর সাধনা, কি দারুণ অধ্যবসায়! ওর হবে!

'কেন লেখো, কেনই বা ধ্বংস করো', ভেবে দেখতে হবে, খোকা মনে মনে হাসলো। ভেবে দেখলেও, ঠোঁটে লিপিস্টিক ঘষার মতো সহজ ক'রে বলা কি কোনোদিন সম্ভব হবে!

একের পর এক সিগ্রেট পোড়াতে থাকে খোকা, শেষ পর্যন্ত ময়নাকে কেন্দ্র ক'রে তার ক্ষোভ ডালপালা বাড়ায়; কি ক'রে পারলো রঞ্জু এমন একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে!

খোকার বিশ্বাস, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ির। কোনো গোপন অভিলাষ দ্বারা কি অজ্ঞাতসারে সে প্ররোচিত হয়েছে?

মুরাদের কথা মনে হ'লো খোকার। তার ধারণা মুরাদের মনোভাব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলো সে। প্রথম থেকেই আমতা আমতা করছিলো। ক'দিন থেকে একনাগাড়ে কিল খেয়ে কিল হজম ক'রে চলেছে, এটা ওর স্বভাবই নয়। রঞ্জুর দিকে মুরাদের তাকানোর ভঙ্গিটাও কিছুটা কুৎসিত ধরনের। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় মুরাদ, আর জোর ক'রে চোখমুখে এমন একটা নিস্পৃহতা আনে যাতে মনে হয় নিদারুণ বীতশ্রদ্ধ সে এখন। এ চালাকি সে ভালো ক'রেই বোঝে, নিরাসক্তির ব্যাপারটা স্বভাবের, জোর ক'রে কেউ নিরাসক্ত হ'তে পারেনা। অতো লুকোচুরির কি আছে; বন্ধুর বোন থাকলেই তাকে গিলে খেতে হবে! একটা মফস্বলের স্বভাব, গ্রাম্যতা! অগ্রপশ্চাৎ কোনো বিবেচনা নেই, মেয়ে দেখলেই বনবন ক'রে মাথা ঘুরে যায়, কি হাঘরে স্বভাব এদের। এই স্থূলরুচির আমড়া কাঠের ঢেঁকিগুলো বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে জানে না। হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে এসেছো কি বিপদ, শুরু হ'য়ে গেল চুলবুলুনি, গাবাগাবি; লটকাও বন্ধুর বোনকে!

মুরাদের আহত মুখচ্ছবি ভেসে উঠলো। ব্যথিত হয়েছে মুরাদ। কথা বলতে পারছিলো না, কেঁদে ফেলার উপক্রম হয়েছিলো বেচারার। গায়ে প'ড়ে হুরমুশ করেছিলো সে, মুরাদ ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়েছিলো; এ ধরনের আক্রমণের জন্যে তার কোনো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। অমন উদোম আলাপের পর তার আর কোন পথই ছিলো না গোপন কথা ওগরানোর। সে ইচ্ছে ক'রেই হাতে হ্যারিকেন দিয়েছে, এক অর্ধচন্দ্রেই একেবারে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে।

এক সময় খুব খারাপ লাগলো খোকার ; নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছিলো সে, তার নিজের ব্যবহারও খুব একটা রুচিসম্মত নয়, মনে হ'লো এইসব। সময় সময় এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে যাই, খোকা শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো, মুরাদের সঙ্গে এই নির্দয় ব্যবহার বন্ধুত্বের অতি সাধারণ একটি দাবিকেও অস্বীকার ক'রে যায়। কিন্তু কেন, সব ব্যাপারটা আগাগোড়া সুন্দরভাবে শেষ ক'রে দেওয়াও তো এমন কোনা কঠিন কাজ ছিলো না ! স্পষ্ট বললেই হ'তো, রঞ্জুর দিক থেকে সে তার চোখ ফিরিয়ে নিক। নিছক কষ্টের ভিতর পা বাড়িয়ে কি লাভ তার ! সে ভুল বুঝেছে রঞ্জুকে। রঞ্জু ভিন্ন ধাতের মেয়ে, ওর নিজেকেই পস্তাতে হবে শেষ পর্যন্ত। সে তো জানেই তার স্পষ্টবক্তার সুনাম আছে ; শুধু এই সুনামটুকুই তাকে ভাঁঙাতে হ'তো। কাটগোঁয়ারের মতো সে বেছে নিয়েছিলো উল্টো পথ।

স্নায়বিক উত্তেজনা খোকাকে এলোমেলো ক'রে দিলো এক সময়। এ ধরনের অস্থিরতার সঙ্গে তার কখনো পরিচয় ঘটেনি ; এমন এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে আজ, যেখানে তার সব দৃঢ়তা মোমের মতো নিঃশব্দে গ'লে গ'লে পড়ে। আক্রোশে ফেটে পড়ে খোকা, বন্ধুত্বের সহজ নিবিড় সম্পর্কের মাঝখানে বাতুল সমস্যা এনে রেষারেষির প্রয়োজনই বা কি ! গাঁউয়া, নিরেট গাঁউয়া এই মুরাদ ; স্বেচ্ছায় সবকিছু দুষিত আবর্জনাময় ক'রে তুলতে সে মনে মনে বদ্ধপরিকর। বন্ধুত্ব আর ডাস্টবিনের ভিতর কোনো পার্থক্য নেই।

বুকের তলার বালিশকে দুমড়ে দেয় খোকা। রঞ্জুর মতো মেয়ের কথা ভেবে সবকিছু বাস্তবতার নির্মল আলোকে বিচার ক'রে দেখা উচিত ছিলো মুরাদের। চার বছর যাবৎ দেখে আসছে মুরাদ রঞ্জুকে। এখনকার আর পাঁচটা ডুগডুগি বাজানো মেয়েদের মতো বেলেল্লা নয় রঞ্জু, অনেক আগেই তার বোঝার কথা। নিছক একটা ঘরকুনো মেয়ে,

খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সারাদিনের ভিতর একটিবারও যার রাস্তার দিকে চোখ মেলে তাকাবার প্রয়োজন হয় না। তার এই আড়ষ্টতার কথা, ঘরকুনোমির কথা, নিজের কুণ্ডলীর ভিতর অচৈতন্যপ্রায় প'ড়ে থাকার কথা, খুব ভালো ক'রেই জানে মুরাদ।

না কি রঞ্জুই ওকে সাহস জুগিয়েছে?

সাহসের যে যোগানদার তার নিজেকেও সাহসী হ'তে হবে এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। রঞ্জু নিজে কতটুকু সাহসী? সব কিছুই কি নিখুঁত একটা অভিনয়? দিনের পর দিন স্রেফ অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে রঞ্জু?

রঞ্জু একটা দারুণ সমস্যা, এতোদিনে হঠাৎ মনে হয় খোকার। মুরাদকে কি সে গোপনে গোপনে কোনো চিরকুট চালান করেছে? এমন বুকের জোর পেল কোথা থেকে মুরাদ? রমনা রেঁস্তরায় মুখের উপর ফশ ক'রে একটা চিঠি ছুড়ে মারলে তার কি দশা হ'তো? নিজের সঙ্গে যুদ্ধ চলে খোকার।

শেষ পর্যন্ত খোকা সন্ধি করে। রঞ্জু রঞ্জুই; রঞ্জু যদি ছিটেফোটা অনুকম্পাও করতো মুরাদকে, তাহলে নিজেকে ঢেকে রাখতো মুরাদ, অহংকারের তাপে তার মনোবল অবলম্বন করতো ভিন্ন পথ; আকুলি-বিকুলি করতে হ'তো না তাকে অমন। এটা একটা একপেশে ঘোড়ারোগ, আলোচাল দেখে যেমন ভেড়ার মুখ চুলকায়।

বেলীর কাণ্ডকারখানা দেখে কতোবার মুখ টিপে হেসেছে রঞ্জু। বিছানার উপর বিশ্রীভাবে শুয়ে থাকার জন্যে দুম ক'রে একবার কিল বসিয়েছিলো বেলীর পিঠে। বেলী জোর ক'রে যখন তাকে সস্তা সিনেমার গল্প শোনায় সে তখন বেলীর অজান্তে ঘুমিয়ে কাদা হ'য়ে থাকে; ঝিঁঝিঁপোকার একটি ফিনফিনে ডানা, একফোটা বৃষ্টির ভারেও যা মচকে যায়।

রঞ্জুকে একবার জিগেশ ক'রে দেখলে কি হয়?

উচিত হবে?

না, উচিত হবে না। ঘৃণায় কুঁচকে যাবে রঞ্জু। কদর্য চোখকে কি ক'রে ঘৃণা করতে হয় সে তা জানে। সে জানে, সে কোনো কুড়নো মেয়ে নয় রাস্তার, ফ্যাল্‌না হ্যাতাকুড়ুনি পাতাকুড়ুনি নয়; নোংরা এঁটো চোখে কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে একথা শুনলে আতংকে শিউরে উঠবে সে।

মুরাদের উচিত তার ওই যাত্রাদলের সস্তা স্বভাব বদলানো। স্পষ্ট ব'লে দিতে হবে ওকে। য়্যুনিভার্সিটিতে থাকার সময় যে সব বদভ্যাস ছিলো এখনো কিছু কিছু তার থেকে গিয়েছে। ওর নজরটাই খারাপ। টিউটোরিয়্যালের চিন্তায় অন্যদের মাথার ঘিলুর ভিতর যখন কিলবিলে পোকার কামড়ানি চলছে ও তখন করিডোরের মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণী পায়চারিতে মশগুল। পুরুষ্ট মেয়েদের দেখলেই ওর চোখ ছানাবড়া হ'য়ে যায়। বলতো-ও মাঝে মাঝে, থর নামা দেখলে আল্লামিয়াকে ভালোবাসতে ইচ্ছে ক'রে আমার, ভালো কাম যদি তাঁর কিছু থেকে থাকে তাহলে এই সবই। এমনকি রাস্তাঘাটে ভারবাহী জন্তুর মতো স্বাস্থ্যভারানতা যুবতী দেখলে ও পাগলামি শুরু ক'রে দেয়, নাল গড়ায় ওর নোলা দিয়ে। হঠাৎ রঞ্জু ওর মাথার ভিতরে ঢুকলো কি ক'রে ভেবে পায় না খোকা; কে বলবে এটা তার পুরানো স্বভাবেরই একটি অপভ্রংশ নয়। 'স্বাধিকার প্রমত্ত আজকের মানুষ' কপচাবার সময় দিব্যি আবার বদলে যায়।

রঞ্জু কি?

একটা টিনটিনে ফড়িং। দেখে মাতলামি চাগিয়ে ওঠার মতো কিছুই নেই ওর শরীরে। আদর ক'রে একটু জোরে চাপ দিলেই মুড়মুড়িয়ে ভেঙে যাবে ওর হাত। পায়ের তলায় সামান্য একটু কাঁকর ফুটলে এখনো চোখমুখ সাদা ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়। এখনো

কাঁটা বেছে পাতে তুলে না দিলে ইলিশ মাছ খেতে পারে না। এতো পলকা এতো কোমল যে সামান্য একটি দুর্বাঘাসের ভারও তার জন্যে অনেক ; এইভাবে তাকে তুলোয় মুড়ে রাখতে খোকার ভালো লাগে।

ক্ষয়রোগ তলে তলে কুরে খায়, তারপর আচমকা একদিন এক ঝলক রক্ত তুলে কেতন উড়িয়ে জাহির করে নিজেকে ; বয়েস ও একটা ক্ষয়রোগ। বুকের ভিতর ফাঁকা হ'য়ে গেল খোকার ; আর সেই আসবাবপত্রহীন ফাঁকা ঘরে আপন অসহায়তার নুলো হাতে পিটপিটে কুপির আলো দেবার জন্যেই হাই হুম হাম শব্দ করলো দু'চারবার। তার যাবতীয় দুর্ভাবনার গায়ে আকুলতার পুঞ্জ পুঞ্জ আর্দ্রতা জমে ঃ হয়তো আমার নিজের চোখে ধরা পড়ছে না, নিরন্তর সাবধান ক'রে দিচ্ছে এই চোখ আমাকে, 'তুমি কোনোদিন সত্য উচ্চারণে সফলকাম হবে না এবং যাতে সফলকাম না হও সেইমতো একজোড়া কড়ির চোখ হ'য়ে আজীবন আমি তোমাকে পাহারা দেবো।' মুরাদকে কি আমি হিংসা করবো, আমার চোখজোড়া ওর মতো সন্ধানী নয়। ও যা দেখতে পায় আমি তা দেখিনা কেন ! গাছের একটি ভিজে পাতায় চন্দ্রালোক ছাখে মুরাদ, আমি দেখি উদ্যত ফণা, ফলে আছাড় খেয়ে পড়ি দুঃস্বপ্নে। রঞ্জু কি হঠাৎ বড় হ'য়ে গেল ?

ঘুম এলো না কিছুতেই। উঠে পানি খেলো খোকা। সিগ্রেট ধরালো। বই খুলে চেষ্টা করলো মনোযোগ দেবার, কিন্তু সবই বৃথা, শত চেষ্টা ক'রেও একটা পৃষ্ঠা ওল্টাতে পারলো না সে। কি হয় বই প'ড়ে, অপরিসীম শ্রান্তি ও অনমনীয় কাতরতায় একটু একটু ক'রে সে নুয়ে পড়ে ; সে জানে এমন একটি চিন্তাও নেই সম্পূর্ণত যা তার নিজস্ব, একেবারে নিজের বলতে যা আছে তা কেবল যন্ত্রণা। এই একটাই সম্পত্তি যা একান্তভাবেই তার

নিজস্ব। প্রত্যেকটি মানুষের যন্ত্রণা যার যার নিজের মতো, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, এই একটিই সম্পত্তি যা কারো কাছ থেকে ধার নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

শেষে পায়ে পায়ে রঞ্জুর ঘরে ঢুকলো।

বনস্পতির ছায়ার মতো মনোরম সবুজ আঁধার হালকা পাতলা ছিমছাম রঞ্জুর এই একটিপ শরীরটুকুকে কোমলতায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মনে হয় রাশি রাশি পাতার ফাঁক দিয়ে আসা এক চিলতে জ্যোছনার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন আলো, যেন লতাগুল্মের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস: রাত্রিরানীর স্খলিত বসনের একটি চিকন সোনালী সুতো, ডাকবে কি ডাকবে না ভাবতে ভাবতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খোকা।

তারপর একসময় আলো জ্বেলে দেয় খুট ক'রে।

'ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

'না।'

'ঘুম আসছে তোর?'

'না।'

'আমারও ঘুম আসছে না। বসবি কিছুক্ষণ বারান্দায়?'

'উঠছি—'

ভিতরের বারান্দায় বসলো দু'জন। জ্যোছনার ঢল নেমেছে আজ। খুব কাছাকাছি কোথাও একটানা ডেকে চলেছে একটি পাখি।

'মাঝে না সিগ্রেট কমিয়ে দিয়েছিলি?'

'কেন?'

'এতো সিগ্রেট টানছিস কেন আজ?'

'কি জানি—'

'তুই না বলিস, বেশী সিগ্রেট খেলে ঘুম হয় না?'

'মনে করিয়ে দিবি তো!'

'আমি জানি—'

'কি জানিস ?'

'তোর মন খারাপ।'

'কই ?'

'নিজের মুখ তো আর দেখতে পাচ্ছিস না!'

'তোরও তো মন খারাপ!'

'বললেই হ'লো—'

'অতো চোটপাট করলে কে তখন ?'

'সে তো তুই—'

'পান্তুয়াটি! কাটমোল্লা ব'লে গাল দিসনি ?'

খোকার একটা হাত ধ'রে আবার ছেড়ে দিয়ে বললে, 'কই দেখা তো কোথায় ফোস্কা পড়েছে!'

খোকা বললে, 'তুই যদি আর কোনোদিন আমার সঙ্গে মুখ কালো ক'রে কথা বলিস, তাহলে তার ফল খুব ভালো হবে না, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু ভাগোয়াট হ'য়ে যাবো—'

'দিন দিন তোর আবদার বেড়ে যাচ্ছে।'

'আর তুই বুড়ি হ'য়ে যাচ্ছিস—'

'বুড়ি তো হবোই, তোর মতো ?'

'তুই বুড়ি হ'তে পারবি না।'

খোকা সিগ্রেটের প্যাকেটে হাত দিতেই রঞ্জু কেড়ে নিলো, বললে, 'খবরদার আর একটাও ধরাতে পারবি না—'

খোকা বললে, 'তোর এতো মাথাব্যথা কিসের ?' আমার দিকে তোর খেয়াল আছে কোনো ?'

'কে দ্যাখে তবে ?'

'বেলী যে আমার ঘর অমন লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল, তুই কিছু বলতে পারিসনি ? উচিত ছিলো না বলা ?'

'ওর ভালো লেগেছে ও করেছে, আমি বাধা দেব কেন?'

'ইচ্ছে করলে তুই ওকে লজ্জা দিতে পারতিস।'

'মানুষকে কাঁদাতে খুব ভালো লাগে না?'

'আমি বুঝি সবাইকে কাঁদাচ্ছি?'

'তবে কে?'

'তুই একটা মিথ্যুক।'

'তোর মতো কেউ এমন নিষ্ঠুর নয়। আমাকে একা বাড়িতে ফেলে সারাদিন ড্যাংড্যাং ক'রে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ানোর সময় কোনো কিছু মনে থাকে না তোর। যা ভয় লাগে! এই গণ্ডগোলের সময় এতবড় বাড়িতে একা থাকা যায়, না?'

'ঠিক আছে, কাল থেকে দেখিস, পায়ে একেবারে তালাচাবি। যদি কোথাও যাই তোকেও নিয়ে যাবো পোঁটলা বেঁধে, যাবি তো?'

'সকাল পর্যন্ত মনে থাকলে হয়।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হঠাৎ খোকা বললে, 'আচ্ছা এমন যদি হ'তো, আমরা চিরকাল ঠিক এখনকার মতোই ছোট থেকে গেলাম, কি হ'তো তাহলে?'

'ভালোই হ'তো—'

'তোর ইচ্ছে করে?'

'করেই তো!'

'সত্যি বলছিস?'

'না মিথ্যে বলছি, হ'লো তো!'

'আচ্ছা ধর, আমি যদি হঠাৎ ম'রে যাই তোর কি রকম লাগবে, খুব কাঁদবি না? ভেবে ছাখ ঝগড়া করার মতো তোর আর কেউ নেই তখন—'

'আমার খুব মজা হবে!'

'বুঝলাম—'

'মজাই তো! ছাদে বেড়াবো, ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসবো, প্রেমপত্র লিখবো, বিছানা এলোমেলো ক'রে দেবো, যা ইচ্ছে তাই ক'রে বেড়াবো—'

'ইচ্ছে হ'লে এখনো তা করতে পারিস!'

'পারি-ই তো! আমি কি তোর ভয় করি?'

'আমি বুঝি তাই বলেছি?'

'ওনার ভয়ে আমার ঘুম হচ্ছে না কি না—'

'রেগে যাচ্ছিস কেন, তোকে নিয়ে এক মুশকিলই হয়েছে!'

'নিজে সাধুপুরুষ—'

'এই বুড়ি, ও কি রে—' হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে রঞ্জুর একটা হাত ধ'রে খোকা বললে, 'চোখে পানি কেন, কাঁদছিস বুঝি? এই পাগলি কাঁদছিস কেন, কান্নার কি আছে—'

কোনো উত্তর দিলো না রঞ্জু, কেবল একটু জোরে সে ফুঁপিয়ে উঠলো। ওর হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে খোকা বললে, 'কি তাজ্জব কথা, হ'লো কি তোর? কথায় কথায় ভেঁপু—'

'মরার কথা তোলার সময় খেয়াল থাকে না!'

'তাই বুঝি, এর জন্যে এতো ঝড়-বৃষ্টি? আগে তো এ রকম ছিলি না? তুই দেখছি পাগল না ক'রে ছাড়বি না!'

'কেন তুলবি তুই ওসব বাজে কথা?'

'ভুল হয়েছে বাবা, মাফ ক'রে দে—'

'কি অন্যায় করেছি আমি, যে তুই ওসব অলক্ষুণে কথা তুলবি!'

'আরে বাবা বললেই তো আর কেউ মরে না, মরা কি অতো সহজ!'

'কি জানিস তুই, কখন কোন কথা লেগে যায়, কখন কোন কথা সত্যি হ'য়ে যায়!'

'ঠিক আছে, আর কখনো বলবো না, কথা দিচ্ছি!'

ভেজা চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো রঞ্জু। বললে, 'সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবি না। কিন্তু—'

'আবার ? মাথা খারাপ তোর !'

'বুক আলগা কর—'

খোকার পরনে ছিলো পাঞ্জাবি। দুটো বোতাম খুলে ফেললো সে। রঞ্জু থুথুথু ক'রে তিনবার তার বুকে থুতু দিলো।

'যাক্ বাবা, এ যাত্রা কোনোমতে টিকে গেলাম !'

+

রঞ্জুকে মতিঝিল কলোনীতে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে এলো খোকা ; দুপুরের পর তাকে আবার যেতে হবে আনতে।

গেটের মুখেই দেখা লুলু চৌধুরীর সঙ্গে ; ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলো না খোকা নিজের চোখকে। তাকে না পেয়ে বিমর্ষ মুখে ফিরে যাচ্ছিলো লুলু চৌধুরী।

'খুব আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছেন না ?'

'কিছুটা—' ড্রইংরুমে বসালো খোকা লুলু চৌধুরীকে।

ময়ূরনীল জর্জেট শাড়ি লুলু চৌধুরীর পরনে। বসার সময় কোলের উপর আঁচল ঝ'রে পড়ে। ত্রস্ত হাতে কাঁধে আঁচল তুলে লুলু চৌধুরী বললে, 'কোনো অসুবিধে করলাম না তো ?'

নিরুৎসাহিত খোকা বললে, 'ঠিক তা নয়, তবে আপনাকে যার আপ্যায়ন করার কথা আপাতত সে ঘরের বাইরে, আমার বোন রঞ্জুর কথা বলছি—'

'আপনি তো আছেন !'

কিছু একটা বলতে হয় তাই বলা, এমন ভঙ্গিতে গা ছেড়ে খোকা জিগেশ করলে, 'মুরাদ ঘরে, না বেরিয়েছে ?'

'এতোক্ষণে বোধহয় বেরিয়ে পড়েছে। চিন্তা করলেন কিছু ?'

'বুঝতে পারছি না!'

'বা-রে, বেমালুম ভুলে ব'সে আছেন সব ?'

'আপনি কি সত্যিই সিরিয়াসলি নিয়েছেন ব্যাপারটাকে ?'

'বেশ লোক তো আপনি!'

'অযথা সময় নষ্ট হবে আপনার, ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন।'

'আমার কাজই হ'লো সময় নষ্ট করা। রুটিন ধ'রে সময় নষ্ট করতে হয় আমাকে—' লুলু চৌধুরী বললে, 'আপনাকে ব্যাপারটা খুলে বলি, বাঘা বাঘা কর্তাব্যক্তিদের কয়েকজনকে নিয়ে আমরা একটা গ্রুপ কোম্পানির পেট চিরে বেরিয়ে আসছি খুব শিগগির, উদ্দেশ্য নতুন কোম্পানি খাড়া করা, হয়তো কিছু কিছু শুনেও থাকবেন—'

খোকা বললে, 'আমি কিছু শুনিনি, এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই!'

'কেন, বাইরে তো যথেষ্ট কাগজপত্র ছেড়েছি আমরা। বুঝলেন-না, এই-ই হচ্ছে প্রকৃত সময়। সব টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হোক এখন আর বাঙালীদের কেউ তা চায় না। হেড অফিসগুলো সব পশ্চিমে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, দেশের লোক কিভাবে ক্ষেপে উঠেছে, সকলেই চাচ্ছে দেশের টাকা দেশেই থাকুক, দেশেই খাটুক—'

বাধা দিয়ে খোকা বললে, 'সকলেই চাচ্ছে, না আপনারা তাদের জ্ঞানদান করছেন ?'

লুলু চৌধুরী হেসে বললে, 'দেশের লোকই চাচ্ছে—'

খোকা আবার বাধা দিলো। বললে, 'দেশের লোক যে কি চায় তারা নিজেরাই তা জানে না; হাত তুলতে বললে সবাই হাত তোলে, ঐ পর্যন্তই!'

লুলু চৌধুরী অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'আপনি ঠিক ধরতে পারেননি ব্যাপারটা। দেশে রাজনৈতিক দল রয়ে গেছে, মান্যি-গন্যি নেতারা আছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের কিংবা দলের স্বার্থের কথা বিবেচনা ক'রে দেশের লোককে যেদিকে ঠেলে দেবেন, তারা সেই দিকেই যাবে, কিছুই করার নেই আপনার-আমার। আমাদের কাজ হবে শুধু পাবলিক সেন্টিমেন্টটাকে মূলধন ক'রে সময় মতো তা কাজে লাগানো, আমাদের ভূমিকা তো এই-ই!'

'এক মিনিট, চা না কোল্ড ড্রিংক?'

'না চা নয়—'

উঠে ফ্রিজ থেকে কোকাকোলা বের করলে সে, তারপর গ্লাসে ঢেলে লুলু চৌধুরীর সামনে দিলো।

খোকা বললে, 'তার মানে দেশের লোককে চুঁষে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দেওয়াটাই সব প্রোগ্রামের মূল কথা—'

'যেমন?'

'শুধু বীমা কোম্পানির কথা ভাবছেন কেন, সকলকেই যে যার স্বার্থে আদাজল খেয়ে ঐ সেন্টিমেন্টকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে, ফলটা কি দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত?'

লুলু চৌধুরী বললে, 'আপনি কিন্তু পলিটিক্যালি চিন্তা করছেন!'

খোকা বললে, 'যাকগে যাক, খামোখা এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আসল কথা আমার মতো অপদার্থকে দিয়ে আপনাদের কোনো লাভই হবে না!'

'দু'এক দিনের ভিতরই বাজারে শেয়ার ছাড়া হচ্ছে—'

খোকার মনে পড়লো মুরাদের কবিতা সংকলনের কথা। সে হেসে বললে, 'ভালো সময়ই বেছে নিয়েছেন আপনারা—'

লুলু চৌধুরী বললে, 'কোনো তাড়াহুড়ো নেই, আপনি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন সবকিছু, কিছু শেয়ার কেনার জন্যেও তৈরি থাকুন।'

কোনো উত্তর দিলো না খোকা, এটা এমনই একটি বিষয় যা নিয়ে কথা বাড়ানোর আগ্রহ তার বিন্দুমাত্র ছিলো না! এছাড়াও লুলু চৌধুরীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে অপ্রিয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফেরে পড়েছিলো। লুলু চৌধুরীর এই হামলে পড়া উৎসাহের গায়ে যে রঙের আবরণই থাকুক না কেন, খোকা সেটাকে সহজভাবে নিতে পারে না। সন্দিগ্ধচিত্তে কেবল সে নিজের বিচার বিবেচনাকে তলব করতে থাকে!

'লিখছেন নাকি কিছু?' হঠাৎ জিগেশ করলে লুলু চৌধুরী। খোকার মনে হ'লো লুলু চৌধুরীর গলার স্বর জর্জেটের আঁচলের চেয়েও স্নিগ্ধ মধুর, কিন্তু পিছলে পড়া।

'কে বললে আপনাকে আমি লিখি?'

'এক সময় আপনি লিখতেন, মুরাদের মুখে শুনেছি, দেখলেও বোঝা যায়। আপনার চেহারা কবির—'

খোকা বললে, 'মুশকিলে ফেললেন। আমার তো ধারণা ছিলো খুন করার পরই মানুষের চেহারা খুনীর হয়, তার আগে নয়। কবিদের মধ্যে আপনি কাকে কাকে দেখেছেন?'

'খুব প্যাঁচালো মানুষ আপনি—'

'আপনার ধারণা ভুল। এক সময় মাথায় গুবরে পোকা ঢুকেছিলো ঠিকই, ঐ পর্যন্তই; সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না, আপনার কোম্পানির ঐ কাজের মতোই—'

'বৈরাগী হ'য়ে যাবেন নাকি শেষ পর্যন্ত?'

'চাইলেও হ'তে দেবেন আপনারা!'

'তার মানে, আপনি আমার বন্ধু হচ্ছেন?'

'সে তো এখনো-ও।'

'মনে হচ্ছে না আমার—'

খোকা হেসে বললে, 'আপনার একদম ধৈর্য নেই!'

লুলু চৌধুরী বললে, 'আপনি বোধহয় মেয়েদের খুব ঘেন্না করেন ?'

'মেয়েদের ঘেন্না করা যায় ?'

'কেন যাবে না, এটা মনের ব্যাপার, ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার ; এ রোগে তো অনেকেই ভোগে—'

'আমার এ রোগের বালাই নেই। গোটা নারীজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম—'

'মানে আপনার কাছে তারা ঠাট্টার বস্তু !'

'সেটা নির্ভর করে সম্পর্কের উপর। ধ'রে নিতে পারেন এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, যাকে বলে কোরা, অশিক্ষিত—'

'আশ্চর্য কথা ! অথচ আপনার চেহারা একজন প্রেমিকের—'

খোকা বুঝলো কয়েকটি অলীক শাখা-প্রশাখায় ভিজে বাতাসের ঝাপটা লাগছে, শিউরে উঠছে বর্শাফলকের মতো তীক্ষ্ণ কিছু পাতা। ফলে কোমল মূর্ছা তার যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কিছুক্ষণের জন্যে বিবশ ক'রে দেয়।

সে হেসে বললে, 'গালমন্দের একটা নিজস্ব ভাষা আছে আপনার !'

লুলু চৌধুরী বললে, 'তবু যাহোক একটা কিছু খুঁজে পেলেন শেষ পর্যন্ত, আমার আসাটা সার্থক হ'লো। সবচেয়ে মুশকিল আপনাদের মতো ধ্যানী মানুষজনকে নিয়ে ; ভাঁজ খুলতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়তে হয়।'

'ধ্যানী বলতে কি বোঝাচ্ছেন ?'

'সত্যিকথা বলবো ?' বড় বড় চোখে তাকায় লুলু চৌধুরী।

'বলবেন না কেন !'

'যারা শুধু অপচয় করে নিজেদের, জীবনভর—'

'তার মানে আপনার অভিধানে মূর্খরাই ধ্যানী। আপনার সঙ্গে আমি একমত ; এই একটা ব্যাপারেই কখনো কোনো কিছু জানার দরকার হয় না।'

কিছুটা দোমনা মনে হ'লো লুলু চৌধুরীকে এক সময়। কোলের উপরে ফেলে ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আনমনা হ'য়ে যাচ্ছে এক একবার।

লুলু চৌধুরীর দুটি পা এতোক্ষণে চোখে পড়ে খোকার, কি ধবধবে নিটোল ও মসৃণ! মনে হয় প্রতিদিন পা দুটি দুধে ভেজানো থাকে ; এখনো লেগে আছে সর। দেহের যাবতীয় কোমলতা গড়িয়ে গড়িয়ে পায়ের পাতায় এসে জমেছে ; নীলঝরনার কোলে একজোড়া অলৌকিক রাজহংসী যে যার নিজের শুভ্রতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন।

মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে সে তাকিয়ে থাকে ; তার দু'চোখ নির্লজ্জতার সম্মোহনে আত্মহারা হয়।

প্রতিটি আঙুল যেন নিস্তব্ধতার এক একটি ঠোঁট, মনে হয় একদিন এদের ভাষা ছিলো ; প্রতিটি নখ যেন এক একটি মিজরাব, অসংখ্য অদৃশ্য তারে বিলোল আলস্যে মৃদু মৃদু সুর তুলে চলেছে, নৈরাকার স্মৃতির মতো অবিরল শিথিল অবসাদে এক একটি দিব্য মূর্ছনা অর্ঘ্য হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে নাস্তিগর্ভে।

খোকার চোখ তার অতল মুগ্ধ সরোবরে অলৌকিক রাজহংসীদ্বয়কে এইভাবে অবগাহন করায় ; তৃপ্ত হয়।

রৌদ্রের তেজ বাড়ছে বাইরে, আকাশের দিকে তাকালে চোখ ঝাঁ ঝাঁ করে। জানালায় পর্দা গোটানো ছিলো, টেনে দিতে গিয়েও কি মনে ক'রে আবার ফিরে আসে খোকা ; ব'সে সিগ্রেট ধরায়।

'কেমন ভদ্রলোক আপনি, অফার করবেন না?'

প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে খোকা বললে, 'চলে নাকি আপনার?'

'কখনো-সখনো, তবে নেশা নেই। ভালোই লাগে—' আলতো-ভাবে আঙুলের ফাঁকে সিগ্রেট ধরিয়ে লুলু চৌধুরী বললে, 'আমার কোনো প্রিজুডিস নেই—'

'এবার চায়ের কথা বলি বরং—'

'আমি ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা বিয়ারের কথা বলবেন!' আঁচল সামলাতে সামলাতে চটুল ভঙ্গিতে লুলু চৌধুরী বললে, 'একেবারে রসকষ নেই আপনার।'

খোকা বললে, 'ঘরে আমার একটি গার্জেন আছে, মেনে চলতে হয় ওকে। ওসব জিনিশ ঘরে তুলতে দেখলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়বে। আপনার কিন্তু বিয়ার ছোঁয়া উচিত নয়—'

'চামদড়ি হ'য়ে থাকতে বলেন নাকি, চর্বির কথা বলছেন তো?'

'তাই—'

নিজের দিকে অগোছালো দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে লুলু চৌধুরী কৌতুক ক'রে বললে, 'ছিটেফোটা মেদ থাকা তো ভালই; আমারটা কি খুবই দৃষ্টিকটু?'

'এমন মুশকিল আপনাকে নিয়ে—'

'মুশকিল কিসের, সত্যিকথা বলতে আপনার এতো সংকোচ কেন? এরপর আপনার হাতের জন্যে দু'সেট রেশমি চুড়ি আনার কথা ভাবতে হবে।'

'এর চেয়ে বেশী হ'লে আপনি আড়াল হ'য়ে যাবেন—'

এ্যাশট্রের উপর ঝুঁকে আধপোড়া সিগ্রেট গুঁজে দেবার সময় লুলু চৌধুরীর স্খলিত আঁচল মেঝের কার্পেটে ঝ'রে পড়লো। একফালি আঁটো চোলির কারাযন্ত্রণায় গুমরানো স্তনদ্বয়কে ভীষণ দুঃখিত মনে হয় খোকার! অসাধারণ লজ্জায় নিদারুণ বিস্মৃতির ভিতর জগতের এই একমাত্র উজ্জ্বল দুঃখে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

'এবার ওঠা যাক—'

'উঠবেন?'

'অনেক বোর করলাম আপনাকে!'

'অনেক—'

'আমি কিন্তু আবার আসছি।'

পায়ে পায়ে গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেল খোকা। বললে, 'একটু পরে আমাকেও বেরুতে হবে, আসুন তাহলে—'

ফিরে এসে ঝটপট স্নানাহার সেরে ফেললো খোকা। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আয়েশ ক'রে বিশ্রাম নিলো কিছুক্ষণ, তারপর বেরিয়ে পড়লো মতিঝিলের উদ্দেশ্যে।

রঞ্জু বারান্দায় তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো, খোকা রিকশা থেকে নেমেই হাত দেখালো, ইশারা করলো চ'লে আসার।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে উঠতে হ'লো দোতলায়, সেজখালা ডাকলো তাকে।

খোকা বললে, 'দেরি করতে পারবো না!'

সেজখালা বললে, 'কি চিন্তা করলি, যাচ্ছিস তোরা?'

খোকা বললে, 'রঞ্জুকে বলেছিলাম, বলছে যাবেনা—'

'আর তুই?'

'বাড়ি দেখবে কে?'

সেজখালা অসন্তুষ্ট হ'য়ে বললে, 'কি জানি, তোরা কি বুঝেছিস তোরাই জানিস। প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে, আর তোরা বাড়ি বাড়ি ক'রে অস্থির হ'য়ে উঠেছিস। বাড়ি-ঘর-দোর যেন আর কারো নেই। মারামারি বেধে গেলে তাল সামলাতে পারবি?'

খোকা বললে, 'শুনছি তো সব মিমাংসা হ'য়ে যাচ্ছে—'

সেজখালা বললে, 'সেতো আমরাও শুনছি, কিন্তু মানুষজনের শহর ছেড়ে গ্রামে পালানোও তাই ব'লে বন্ধ নেই। না আছে

মাথার ওপর কেউ, না আছে কোনো কাণ্ডজ্ঞান, শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারলে হয়—'

খোকা বিরস কণ্ঠে বলল, 'এত সব লম্ফঝম্ফ সেকি শুধু শহর ছেড়ে গ্রামে পালানোর জন্যে, কিছু আসেনা আমার মাথায়!'

'বুঝিনা বাপু, শুনছি তো হুড়দাঙ্গা হবেই—'

সেজখালা আড়াল হ'তেই বেলী এসে দাঁড়ায়। তার চোখের কোলে কালি, দুশ্চিন্তাকাতর মনে হয় খোকার।

'কবে তোর রাগ পড়বে?'

খোকা বললে, 'কোনোদিনই না—'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো বেলী, রঞ্জুকে দেখে সে থেমে গেল।

রঞ্জু বললে, 'যাবি তো তৈরি হ'য়ে নে—'

বেলীর মুখ ম্লান। সে বললে, 'আজ থাক!'

'তখন যে বললি যাবি?'

'ইচ্ছে করছে না আর এখন—'

'রংবাজি!'

রঞ্জুকে নিয়ে এক সময় বেরিয়ে পড়লো খোকা, রিকশা ধরলো সেগুনবাগিচার। সেই পুরানো গোঁ রঞ্জুর, কিছুতেই যাবে না সে, কিন্তু কোনো ওজর-আপত্তিই শুনবে না খোকা; সে বললে, 'বড় অবাধ্য তুই!'

'তাই ব'লে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকতে হবে?'

'এক-আধদিন এ রকম হ'য়ে যায়—'

রাজীব ভাই দু'দিন যাবৎ বাইরে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে। খোকাকে দেখে খুশি হ'য়ে বললে, 'এ-ক'দিন কোথায় ছিলে খোকা সাহেব, হাতা গুটিয়ে সংগ্রামে নেমে পড়েছো বুঝি?'

'নিজের সঙ্গে সংগ্রাম—' খোকা বললে।

'আমার মতো!'

'আপনারও তাই চলছে নাকি ?'

'চলছে তো বটেও, শরীরটাও ভালো যাচ্ছেনা ; বল পাচ্ছিনা দেহে, মাথা ভার হ'য়ে আছে, নাক কান বুঁজে শুধু বিছানায় প'ড়ে থাকতে ইচ্ছে করে।'

নীলাভাবী বললে, 'শরীর ঠিকই আছে, চিন্তায় চিন্তায় অমন হয়েছে ওনার। দিনকাল খারাপ, ঐ সাত রাজার ধন নিয়ে বাইরে যাবেই বা কিভাবে, বুঝলে না ?'

'তুমি তো বলবেই—'

'বলবো না কেন, কথাটা কি মিথ্যে ?' কবে তোমার শরীর খারাপ করেছে শুনি ? দু'ডিগ্রী জ্বর নিয়েও তো বাইরে দৌড়ও, পাগলের ছাঁট আছে মাথায় !'

'একেবারে পাগল হ'তে পারলে তো ভালোই ছিলো, আধা আধা কোনো কিছুই ভালো না, খোকা কি বলো ?'

নীলাভাবী রঞ্জুকে নিয়ে অন্য ঘরে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রাজীব ভাই কালিপড়া রুগ্ন চোখ তুলে জিগেশ করলে, 'কি রকম বুঝছো সব কিছু ?'

খোকা বললে, 'মহাদুর্দিন সামনে সবাই বলছে, আমার মাথায় তো কিছুই আসেনা। এতসব আলাপ আলোচনারই বা দরকার কি ? এক একবার মনে হচ্ছে সব মিটমাট হ'য়ে যাবে, কখনো মনে হচ্ছে সবটাই একটা ফাঁকি, কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে বিশ্বাস করবো বুঝি না !'

সিগ্রেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান মারতে লাগলো রাজীব ভাই। রাজীব ভায়ের রুক্ষ চোয়াল বিশ্রীভাবে ঠেলে বেরিয়েছে, দাড়ি না চাঁচায় পাগল পাগল চেহারা। গর্তে বসা চোখ, দুশ্চিন্তার রেখা কপালে।

খোকা বললে, 'শেষ পরিণতিটা কি, বুঝতে পারছেন কিছু ?'

'আমি কেন, নেতারাও সেকথা পষ্ট ক'রে বলতে পারবে না। বুঝলে না, আমাদের নেতারাও অনেক সময় বুঝতে পারেনা, তারা দাবার গুটিমাত্র, তাদের চালা হচ্ছে।'

'আর সাধারণ মানুষ, তারা ?'

'মোটের উপর তারা অতো ঘোরপ্যাঁচ বোঝেনা। যে অর্থে তারা স্টেডিয়ামে চীনা এ্যাক্রোব্যাটদের শো দেখতে যায়, ঠিক সেই অর্থেই কিংবা সেই উদ্দীপনা নিয়েই পল্টনের মাঠে নেতাদের লেকচার শুনতে জড়ো হয়। যদি একদিকে স্বাধীকার আর অপরদিকে সস্তায় দু'গজ লংক্লথ দেওয়া হয়, তাহলে আগে লংক্লথের লাইনেই তারা মারপিট করবে। তবে সাধারণ মানুষ আমূল পরিবর্তন চায়, একথাও সত্যি—'

খোকা জিগেশ করলে, 'এ সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কি রকম—'

'কারো সামনেই কোনো বাস্তব পরিকল্পনা নেই। সকলের দৃষ্টিই ঘোলা, আচ্ছন্ন। হওয়ার কথা তো এই রকমই ; একে জানা নেই লেখাপড়া, তার উপর দিনের পর দিন তারা প্রতারিত হয়েছে, চোখ ফুটবে কোত্থেকে ? রাজনৈতিক দলগুলোর কথা ভেবে দেখ, কেবল নিজেদের প্রয়োজনে তারা জনসাধারণকে ব্যবহার করেছে এই মাত্র, আর কোনো দায়-দায়িত্ব ছিলোনা কারো কখনো—'

একটু থেমে রাজীব ভাই বললে, 'এখন যে অবস্থা চলছে তাতে খুব বড় ক'রে এইটুকুই বলা যায় আঁধার হাতড়ে বেড়ানো মানুষজন এখন কিছুটা ঐক্যবদ্ধ ; এটা যদি ভেস্তে যায় দেশ অনেক পিছিয়ে যাবে—'

'কিন্তু এর পিছনেও তো দলীয় স্বার্থ রয়ে গেছে।'

'তা থাকুক, সব কথা ফেরানো যায় না। এখন রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ঐ ঐক্যকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।'

খোকা নিস্পৃহকণ্ঠে বললে, 'ঐক্যটাকে এতো দাম দিচ্ছেন কেন, গোঁজামিল নেই, ফাঁক নেই এর ভিতর ?'

'হয়তো আছে, কিন্তু একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—'

খোকা বললে, 'আপনি হুজুগেপনাকে ঐক্য ব'লে মনে করছেন। যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেবার সময়ও এই হুজুগেপনা ছিলো, আয়ুব খান যেদিন প্রথম আসে স্টেডিয়ামের ভিড়ের কথা মনে আছে আপনার ? এরা তো তারাই, সেই মানুষজনই !'

'কথাটা ঠিক, কিন্তু একটা যুগ পার হ'য়ে গেছে এর পর। একথা ভুললে চলবে না। ঐক্যটা এবারে রাষ্ট্রবিপ্লবের চেহারা নিয়েছে, বলতে পারো আগুন ঘাঁটাঘাঁটি ; ঘাড়ের উপরের মামদোরা কিভাবে এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করবে চিন্তার কথা সেটাই। খেয়াল করলে দেখবে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যতো রকমেই দেশকে শাসন করা হ'য়ে থাকুক না কেন তার কোনোটাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না, সব সময় একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা ছিলো তার ভিতর। এখনো আছে, পরেও থাকবে, ওরা চেষ্টা করবে রাখার—'

রাজীব ভাই বালিশ টেনে নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় কাত হ'লো। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে কিছু একটা ভাবলো, তারপর বললে, 'কিন্তু এখানেও কথা আছে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের কথা ভুললে চলবেনা। ওরা যা কিছু করুক, যে মাস্টার প্ল্যানই থাকুক না কেন, ঐ অভ্যুত্থানকে সামনে রেখেই তার আলোকে সবকিছুর ব্যবস্থা নিতে হবে। ওর চেয়ে অনেক অর্থবহ, অনেক ভয়াবহ ধ'রে নিতে হবে এবারের দর কষাকষিকে! ওটা যদি একটা ধাপ হ'য়ে থাকে এটা দ্বিতীয় ধাপ। এখন মানুষজনের আত্মবিশ্বাস অনেক বেশী, তারা জেনে গেছে ইচ্ছে করলেই, ঐক্যবদ্ধ হ'লেই, তারা দেশের শাসনযন্ত্রকে একেবারে বিকল ক'রে দিতে পারে—'

খোকা চ'টে উঠলো। সে বললে, 'আপনি সংবাদপত্রের মতামতগুলোকে বোধহয় বেদবাক্য ভেবে মুখস্ত করেছেন—'

'কি রকম ?'

'সোজা কথা কাগজ না প'ড়ে নিজের মাথায় যা আসে তাই ভাবার চেষ্টা করবেন।'

'কেন, কাগজপত্র তো ভালোই লিখছে—'

'ভালো মানে বেশ্যাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে, যা আগেও করেছে। কে বেশী ক'রে গায়ের কাপড় খুলে নিজেকে দিতে তৈরি, ভালো কাগজ বলতে এই-ই।'

রাজীব ভাই বললে, 'তুমি অন্যদিকে যাচ্ছো। আমি যা বলছিলাম, বাইরে থেকে সামরিক শাসন যতো ভারী জগদ্দল পাথরই মনে হোকনা কেন, তার ভিতরের সীমাহীন দুর্বলতার কথা এক ধাক্কায় জেনে গিয়েছে মানুষজন ; বিচার করতে হবে এইভাবে—'

খোকা বললে, 'যারা এখানে পাহাড় প্রমাণ পুঁজি খাটিয়েছে, কিংবা যারা নিয়ন্ত্রিত পন্থায় বাজার হিশেবে পেতে চায় দেশটাকে, তাদের ভূমিকার কথা আপনাকে ভাবতে হবে। দেশের লোকটোক সব ফালতু কথা, তাদের কাঁউমাউ চিল্লাচিল্লিতে সত্যিই কিছু যায় আসেনা, তা না হ'লে গোটা ব্যাপারটার সামনে এভাবে অনিশ্চয়তা ঝুলে থাকতো না—'

'তারাই বা কি করবে—' রাজীব ভাই বললে, 'বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এতোদিন সুবিধাবাদীদের ম্যাজিক দেখতে দেখতে দেশের লোক কুঁজোব্যাঁকাবোবাহাবাকালা হ'য়ে গেছে ; তা না হ'লে বৃটিশ সিংহকে খেদাবার পরও নতুন ক'রে আবার এই সাত তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক মুক্তির দরকার হ'য়ে পড়বে কেন ?'

'মুক্তিটুক্তির কথা যে বলছেন, এ সম্পর্কে তাদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা আছে, কোনো প্রোগ্রাম আছে ? অর্থনৈতিক মুক্তি ছেলের

হাতের মোয়া নয়। খেলাকথা আরকি, বোবাব্যাঁকাহাবাকালাবেঁড়েদের ঐক্য আবার ঐক্য!'

'কি আর করবে, সত্যিকার চেতনা আকাশ থেকে পড়ে না। রাষ্ট্রব্যবস্থার যাঁতাকলে মানুষজনকে এ যাবৎ শুধু পেষা হয়েছে, মাড়াই করা হয়েছে—'

খোকা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললে, 'অর্থনৈতিক মুক্তিটুক্তি ওসব হাফসোল দেওয়া কথা, বার্নিশ করা কথা, যে যার স্বার্থের কথা ভেবে পাগলা হ'য়ে উঠছে, সবাই ভাবছে যার যার নিজের হাতে চাঁদ পাবে। পোকাপড়া মুখ, পেট বোঝাই হিংসা, নিজেদের বলতে যাদের সম্বল শুধু এইটুকুই তাদের জড়িয়ে খোয়াব দেখার কোনো মানে হয়না। মাথায় বেঁড়ে, চিন্তায় বেঁড়ে, নিজেদের সম্পর্কে কতোগুলি আজগুবি গালগপ্পো সৃষ্টি ক'রে বুক ফুলিয়ে রেখেছে—'

'যতো কথাই বলো, এ বারের ব্যাপার কিন্তু অন্যরকম।'

খোকা বললে, 'যে রকমই হোক', আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, আমি ভাবছি আমাদের কি হবে!'

'তাহলে দেখ, তোমাকেও ভাবতে হচ্ছে—' রাজীব ভাই হেসে বললে, 'সকলের যা হবে আমাদেরও তাই, রক্ত দেবার জন্যে সারা দেশের লোক পাগল হ'য়ে আছে—'

'গ্রামে পালাচ্ছে কারা?'

'এক একজন এক একভাবে রক্ত দেয়। পুশকিনের মতো লোকদের ডুয়েলে রক্ত দিতে হয় কেননা তাদের শরীরে কোনো হ্যানিবলের রক্ত, আবার মারার মতো লোকেরা গরম পানির চৌবাচ্চায় শরীর জুবড়ে রক্ত দেয়, তাদের শরীর ভরা চর্মরোগ—'

একটু ভেবে খোকা বললে, 'খেয়াল ক'রে দেখেছেন, সারারাত কিভাবে কুকুর কাঁদে?'

রাজীব ভাই বললে, 'আশ্চর্য তো, কালরাত্রে আমিও তাই বলছিলাম নীলাকে, ঘুমনো যায় না, মন হু হু করে। তার মানে মড়ক একটা লাগবেই। লাগবে না-ই বা কেন, এতো আর সেই গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন নয়—'

খোকা তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'কাজ কোরোনা, অপিসে যেও না, মাসকাবার হ'লেই যে যার মাইনে তুলে নাও, চেহারাটা ভালোই আন্দোলনের, এর নাম চূড়ান্ত পাগলামি—'

'তুমি কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত, যাচ্ছো কোথাও ?'

'এখনো মনস্থির ক'রে উঠতে পারিনি—'

'একটা কিছু ঠিক ক'রে ফ্যালো সময় থাকতে ; তেমন কোনো বিপাকে প'ড়ে গেলে দেখবে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে।'

'পাবে কি এখনই পেয়েছে—'

'যদি গ্রামের দিকে যাও তোমার নীলাভাবীকে সঙ্গে নিও।'

'আর আপনারা ?'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয় কোথাও নড়া। হাত-পা বাঁধা আমার এখানে। তোমার সিদ্দিকাভাবী খুব সম্ভব আমার কথা মানবেনা, কোথাও যেতে বললে যাবে না, ওর উপর তেমন কোনো জোর নেই আমার, বুঝলে না! খারাপটাই চিন্তা করা উচিত, তৈরি থাকা ভালো।'

'আপনাদের ফেলে নীলাভাবী যেতে চাইবে ?'

'চাইবে না কেন ? এ-তো তার ভালোর জন্যেই। অবশ্য অন্য কোথাও ওকে ভেড়ানো কঠিন, তুমি ব'লেই জোর দিয়ে বলছি।'

কোনো ইঙ্গিত আছে কি এ কথার ভিতর ? ভিতরে ভিতরে খোকা কিছুটা নাড়া খেল। সে দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাকায় রাজীব ভায়ের মুখের দিকে। খোলা জানালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রাজীব ভাই ; শক্ত চোয়াল ও পুরু ঠোঁটে নির্বিকারত্ব ; ঝুলকালির বিন্দুমাত্র ছোঁয়া লেগেছে ব'লে মনে হ'লো না খোকার।

খোকা একটা সিগ্রেট ধরালো। কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে সে নিতে পারছিলো না প্রস্তাবটাকে। রাজীব ভায়ের এই শেষের কথাটির গায়ে সে উদাসিনতার গন্ধ পায়; তার অনুভূতি শির শির ক'রে ওঠে, গায়ে হুল ফোটে। এই ঔদাসীন্যে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আছে একটি প্রবল দুপুর; এই দুপুরে তারা ছিটকিনি তুলে দিয়েছে দরোজার, ছিটকিনি খুলে দিয়েছে সংযমের; সংযম ডেকে এনেছে পৈশাচিকতাকে, পৈশাচিকতা কেশর ফুলিয়ে দুঃখকে, দুঃখ ক্যাকটাসের গায়ে গর্ভপাতের নারকী পুষ্পকে, দংশনে ঘর্ষণে পেষণে লেহনে কামদগ্ধ নিঃশ্বাসে ও চুম্বনে একটি একটি ক'রে পাঁপড়ি ঝ'রে পড়েছে পুষ্পের, পাঁপড়ি খ'সে পড়েছে পায়ের পাতায়, গালে গলায় কটিতটে, কাঁধে বাহুমূলে, নাভীমূলে মর্মমূলে, আঁখিপল্লবে, অশ্রুর মুক্তাফলে, বদ্ধমুষ্টির শঙ্খে, এবং শঙ্খ বের করেছে তার জিহ্বাকে, জিহবা সর্পকে, শ্বেতচন্দন কুঙ্কুম আর কাঁচপোকার টিপে নিজেকে সাজিয়েছে সর্প, কুঙ্কুম চন্দনকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে তার গায়ে এসে বসেছে দিব্য প্রজাপতি, শত সহস্র ফুলের নির্দোষ নির্মেঘ অবিচল বিস্মৃতি তার পাখায়—

খোকা দেখলো রাজীব ভাইকে, ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে একদিকে। ঝুরঝুর ক'রে ভেঙে পড়ে খোকা, টাল খায়। ভিতরে ভিতরে সে মাছি তাড়ানো মনের আলগা রাশকে ক'ষে ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠে না, বিফল হয়।

প্রতিবারই এরকম হয় খোকার। মনে হয় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে, একটি খল দুপুর হাহা ক'রে ওঠে তার সামনে, সে আর তখন পালাবার পথ খুঁজে পায়না। তার অসহায়তায় মর্মমূলে এক ঐন্দ্রজালিক অপচ্ছায়ার প্রসারণে উৎসমুখ খুলে যায় স্বপ্নের; অর্গলবদ্ধ একটি কামরার ভিতরে ছোটাছুটি করতে থাকে সে, ডাঙা কই, আবা আবা, আমাকে ছুঁয়ো না, আবা আবা, আমাকে ধ'রোনা,

আমি তোমার জলকে নামিনি, আমি রেডি বলিনি, আবাবা, তুমি চু ছেড়েছো,, তোমার চু ভেঙে গেছে, তোমার নীলসুতো ছিঁড়ে গিয়েছে চুয়ের, তোমার তার কেটে গিয়েছে চুয়ের, পাখনা ঝ'রে গিয়েছে তোমার চুয়ের, আবা আবা—'

এইভাবে বুড়ি ছোঁয়ার চেষ্টা করে খোকা, বুড়ি খোঁজে। ডাঙা খোঁজে।

ভিতরে এতো পাঁক, গা ঘিন ঘিন করে খোকার, মরা গুগলির খোল আর পচা খড়কে, কুটিকাটি, ভাঙা কলসির কানা, ভাঙা কাঁচ, নীলাভাবীর হিলহিলে পিচ্ছিল হাসি; তার কপাল বেয়ে দর দর ক'রে ঘাম গড়ায়।

'কি ভাবছো?'

রাজীব ভাই স্থির দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে।

'না তেমন কিছু না—'

'মনে হচ্ছে সমস্যায় ফেলে দিয়েছি তোমাকে।'

'সমস্যা মনে করলেই সমস্যা।' এড়ানোর চেষ্টা করে খোকা।

এই সময় নীলাভাবী ঘরে ঢুকলো, পিছনে রঞ্জু। তরমুজের প্লেট এগিয়ে দিলো নীলাভাবী।

রাজীব ভাই বললে, 'ঠিক যেন টুর্মেলিন। তোমাকে দেখাবো। আশ্চর্য মিল।'

একটু পরে স্যুটকেস খুলে একটা পাথরের চাকলা বের করলো রাজীব ভাই। বললে, 'এই দ্যাখো, তরমুজের মতো টুর্মেলিন। উপরটা সবুজ, তারপর সাদা, তারপর কেমন লালচে। এক সিংহলীর কাছ থেকে জোগাড় করেছিলাম বছর দশেক আগে। সবচেয়ে তাজ্জব কথা কি জানো?' একটু থেমে রাজীব ভাই বললে, 'এই এতোদিন পর হঠাৎ আপনা আপনিই চিড় খেতে শুরু করেছে, সারমর্মটা বুঝলাম না—'

১০—

খোকা জিগেশ করলে, 'এই নিয়ে ভেবেছেন কিছু ?'

বাধা দিয়ে নীলাভাবী বললে, 'তোমারও বাতিক কম নয়, পাগলকে সাঁকো নাড়া দেয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো। এক্ষুণি ওষুধ গেলানোর মতো গালগপ্পো ফেঁদে বসবে।'

'ঠিক আছে বাবা, এই আমার মুখে তালাচাবি—' রাজীব ভাই টুর্মেলিন স্যুটকেসে তুলে রেখে বললে, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না !'

রঞ্জুর কাঁধে একটা হাত রেখে নীলাভাবী বললে, 'যা ভালো মেয়ে, এতো ভালো লেগেছে আমার ওকে—'

খোকা বললে, 'বোনটা কার তা দেখতে হবে না !'

'আকাশ পাতাল তফাৎ, এখন বুঝতে পারছি কেন এতোদিন আনোনি। নিজের নাক কাটা যাবার ভয় ছিলো তোমার।'

'ভালো—'

'আমার কি ইচ্ছে করে জানো— 'রঞ্জুর একটা হাত ধ'রে নীলাভাবী বললে, 'আমার ইচ্ছে করে ওকে একরাশ পুতুল কিনে দেই, ও খেলুক, সারাদিন ব'সে ব'সে তাই দেখি।'

খোকা বললে, 'কিরে নিবি নাকি ?'

রঞ্জু মুখ টিপে হেসে বললে, 'যদি সারাদিন খেলতে হয় !'

'তবেই বোঝ—'

'সত্যি ওকে আমার এতো ভালো লেগেছে—'

ভিতরে ভিতরে ক্ষেপে ওঠে খোকা। সে মনে মনে বলতে থাকে, কাকেই বা অপছন্দ তোমার ! তুমি যদি একটা বাইসন হও রঞ্জু একটা হরিণছানা, তুমি লুলু চৌধুরী সব এক গোয়ালের গরু, মালটানা গাব্দাগোব্দা লেল্যাণ্ড ট্রাকবিশেষ, চাকার তলায় পড়লে খেল খতম, গনফট্।

'এবার থেকে সব সময় ওকে নিয়ে আসবে—'

তা না হলে সুবিধে হবে কেন, ওর মাথাটি ভালো মতন চিবিয়ে খেতে হবে না, পারলে বলেই ফেলতো খোকা, কিন্তু রঞ্জু থাকায় সে বিজ্ঞের মতো নীরবে তাকিয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না।

নীলাভাবীর মাথায় গুচ্ছের চুল। রঞ্জু পাটির মতো বিনুনি ক'রে দিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে খোকাকে দেখালো নীলাভাবী। খোকার মনে হ'লো বাড়াবাড়ি, রঞ্জুটাও যেন দিনকে দিন ঠুনকো হ'য়ে উঠছে, কিসের এতো মাখামাখি, খোকার কাছে এসব প্লাস্টিকের ফুলের মতো খেলো মনে হয়।

খুব সম্ভব সুযোগ খুঁজছিলো নীলাভাবী। একফাঁকে খোকাকে একা পেয়ে ভুরু তুলে জিগেশ করলে, 'কি ব্যাপার, কেমন যেন একটু রাগ রাগ ভাব দেখছি তোমার ?'

'তা তো দেখবেই, খুঁটে ঘা করা যাদের অভ্যেস তারা অমন দেখেই !'

'আমাকে দেখে তুমি বিরক্ত হও—'

'তুমি নিজেই একটা বিরক্তি !'

'নতুন ক'রে কোথাও প্রেমে পড়েছো নাকি ?'

'প্রেম ছাড়া তুমি কি আর কিছু শেখোনি ?'

'বড্ড ঠোঁটকাটা হয়ে যাচ্ছো দিনকে দিন, কি হয়েছে কি তোমার ? ঘাড়ে নতুন কোনো ভূত ভর করেছে, বুঝতে পারছি। চুলোয় যাক, নিয়ে যাচ্ছো তো ? কি ঠিক করলে ?'

'আমি কোথায় নিয়ে যাবো ?'

একটা হাত চেপে ধরলো নীলাভাবী। বললে, 'তুমি ছাড়া আর কে নিয়ে যাবে ? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক, যে খেয়ে ফেলবো, না খোঁপার ভিতর সাপ রাখি ? এতো ভয় কেন ?'

'আমি কোনো ল্যাঠার ভিতরে নেই !'

'আমি বুঝি তাই—'

'তবে কি! অন্যের ঝক্কি নিজের কাঁধে নিতে যাবো কেন, আমাকে তো আর ভূতে ধরেনি। এ ভারি অন্যায় আবদার!'

'বড় নিষ্ঠুর তুমি!'

'সর্বনাশ, এতো অল্পেই তোমার কান্না আসে!'

সত্যিই কেঁদে ফেলেছিলো নীলাভাবী। কান্নায় বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিলো গলার স্বর। চোখ মুছে বললে, 'কারো উপরেই তোমার শ্রদ্ধা নেই, ভেবেছো এই ক'রে সুখ পাবে জীবনে। কোনোদিন পাবে না। দগ্ধে দগ্ধে কালি হ'য়ে যাবে তোমার অন্তর, কোনোদিন তুমি সুখী হতে পারবে না, কক্ষোনো না—'

খোকা হেসে নরোম ক'রে বললে, 'ভারি একটা মানুষ আমি, অথচ ভোজালি গুঁজতে হবে কোমরে; ঠিক আছে, চেষ্টা ক'রে দেখবো কোনো ব্যবস্থা হয় কিনা!'

'বিশ্বাস করো', নীলাভাবী আকুল হ'য়ে বললে, 'আমি মরে যাচ্ছি, বিশ্বাস করো খোকাবাবু, আমি মরে যাচ্ছি, আমি হাঁপিয়ে পড়েছি এই সংসারের ভিতর আর টানতে পারছি না, ঘেন্না ধরে গেছে আমার। এর ভিতরে আর কোনো রস নেই, প্রাণ নেই, দিনরাত কবরের ভিতরে প'ড়ে আছি, আস্তাকুড়ে পড়ে আছি, আর পারছিনা এভাবে। আমি তো একটা মানুষ-ই, কতো পারবো আর, শুধু জোড়াতালি, শুধু ভান, এই যে দিনের পর দিন হাবাকালার মতো সংসারের সঙ্গে আঠা হয়ে লেগে আছি এর চেয়ে ঘেন্নার আর কিছুই নেই; অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমি পাগল হ'য়ে আছি একটু আলো বাতাসের জন্যে—'

'আমি ভেবেছিলাম অন্য ধাতের মেয়ে তুমি, তোমার গোড়া শক্ত!'

'শক্তই। শক্ত না হ'লে এতোদিন ঘর করলাম কিভাবে, এখনো ঘানি টানছি কিভাবে? আমার দোষ কি জানো, আমি অভিনয়

ক’রে চলতে শিখিনি। কিন্তু এখন এমন একটা অবস্থা ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে তাই করতে হচ্ছে। এ আমি পারবো না। দিনের পর দিন শুধু দণ্ড দিয়ে যাবো, শুধু দণ্ড দিয়ে যাবো এই চাও বুঝি তোমরা!’

ভিতরে ভিতরে দ’মে গিয়েছিলো খোকা। থলি ঝেড়ে এমন কিছুই সে পেল না যা দিয়ে এই মুহূর্তে তর্ক জুড়ে নিজেকে দুরে সরিয়ে নিতে পারে, ঘাসকুটো ঝেড়ে ফেলতে পারে গায়ের।

সে বললে, ‘সেদিন কিন্তু তুমি অন্যরকম বলেছিলে—’

‘বলো, তুমি বুঝতে পারোনি—’

‘কিন্তু কোথায় যেতে চাও ?’

‘যেখানে খুশি, যেখানে তুমি নেবে, যেখানে আনন্দ, শুধু এই কবর থেকে আমাকে বের করো। সবকিছু অসহ্য হ’য়ে উঠেছে আমার কাছে, মনে হয় সবকিছু ভেঙে চুরমার ক’রে দেই, তছনছ ক’রে দেই, তারপর ছুটে বেরিয়ে যাই দু’চোখ যেদিকে যায়—’

‘দু’দিনের জন্যে হাওয়া বদল ক’রে কি কোনো লাভ হবে, হয়তো আরো এলোমেলো হয়ে পড়বে মনের অবস্থা। ফিরে এসে আরো অসহ্য ঠেকবে সব কিছু, তখন কি করবে ?’

‘সে তখন দেখা যাবে।’

খোকা বললে, ‘কি লাভ, এইভাবে অশান্তি বাড়িয়ে ?’

‘লাভ-লোকসানের কথা ভেবে শিকল তুলে ব’সে থাকতে পারবো না। লাভ করতে নেমেও তো লোকে লোকসান করে। আমাকে নিয়ে তোমার অতো ভাবতে হবে না, তুমি পারবে কি না বলো—’

খোকা নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে, ‘দেখি, কি করা যায়!’

ক্ষেপে উঠলো নীলাভাবী। বললে, ‘আমি তোমার কাছ থেকে আধো আধো বুলি শুনতে চাইনি, পষ্ট জবাব দিতে হবে তোমাকে!’

খোকা তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'তাই ব'লে সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবতে দেবেনা ?'

'এতো ভাবাভাবির কি আছে, তুমি তো আর আমাকে নিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছো না !'

'তুমি কি তাই চাও ?'

'এতো বেশী চাওয়া যায় না। যার কাছে চাইবো তার নিজেরও কিছু দেবার ক্ষমতা থাকা চাই।'

খোকা বললে, 'আমিও তাই বলি, নিজের উপরে আমার কোনো আস্থা নেই। তোমার কাঁধে এখন সৃষ্টিছাড়া নেশা চেপেছে, তুমি ছেলেখেলায় মেতে উঠেছো, পরে পস্তাবে, শুধু কাদা ঘাঁটাই সার হবে।'

'আমার ভালোমন্দ নিয়ে অতো চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। আমি শুধু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই। কেন আমি তিল তিল ক'রে নিজেকে এমন কষ্ট দেবো, দেখাই যাক না স্বার্থপর হ'তে পারি কিনা। যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি, তুমি আমাকে নিয়ে চলো, যেভাবে খুশি আমাকে কিছুদিনের জন্যে রেখে দাও, আমি আমার ভিতকে নড়াতে চাই—'

খোকা মুমূর্ষু কণ্ঠে বললে, 'তোমার সংসার ?'

'আগে ভেবেছিলাম ভালোবাসার জন্যে মানুষ সংসার করে। চায়ের কাপ থেকে চেয়ার টেবিল, সুঁই-সুতো থেকে খাট-পালঙ, কি না নেই সংসারে, শুধু ঐ ভালোবাসা বস্তুটি ছাড়া। অথচ সংসারের ভিতরে দাঁড়িয়ে কি অহংকারটাই না আমাদের, দেখে যাও কতোকিছু নিয়ে এই সংসার, কি না নেই এখানে। থুতু দিতে ইচ্ছে করে আমার, ইচ্ছে করে ঝাড়ুর বাড়ি মারি। জানালার কাঁচ ঝাপসা হ'লে মোছো, ঘরে ঝুলকালি ধরলে সাফ করো, হাঁড়ির তলার কালি মেজেঘষে ওঠাও, নরদমা সাফ করো, শুধু শিকেয়

তুলে রাখো মনকে, দেখার দরকার নেই তার গায়ে ঝুলকালি পড়েছে কিনা, সিটিয়ে যাচ্ছে কিনা! সংসারের তুমি কতোটুকু জানো! একটা গালভরা বুলি, লাশটানা খাটিয়া! এইসব দেখতে দেখতে আমি বিষিয়ে উঠেছি, শুধু আসবাবপত্র; মরা কাঠ, মরা লোহা, মরা কাঁচ, শাড়ি কাপড়ের গাঁটরি-বোঁচকা, ঝাড়ু মারি আমি এসবে। দিনের পর দিন নিজেকে ফতুর ক'রে কেবল এইটুকু বুঝেছি মানুষ সংসার পাতে শুধু চার হাতপায়ে ভালোবাসাকে মারতে। শুধু চুলোচুলি, খুন-খারাবি, ছুরি মারামারি, অথচ তুমি বলতে পারবে না, বলার নিয়ম নেই। সাজসজ্জা ক'রে ঢেকে রাখো। শুধু এই একটা কৌশল শেখার জন্যেই দিনের পর দিন রক্ত পানি করো, কি ক'রে এসব ঢেকে রাখবে, লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেবে।'

খোকা বললে, 'ঠিক আছে, এখন তুমি যাও—' তার ভয় ছিলো যে কোনো মুহূর্তে রাজীব ভাই অথবা রঞ্জু এসে পড়বে এবং সে বিপদে পড়ে যাবে।

এই প্রথম খোকা দেখলো নীলাভাবীকে হতাশায় ভেঙে পড়তে। একটু একটু ক'রে গাঁথুনি ধ্বসে পড়ছে ভিতরের, রুগ্ন মানুষের চেহারা এখন নীলাভাবীর। তা হোক, ঘোলা আর জটিল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মতো মানসিক স্থৈর্য খোকার এখন নেই।

এক সময় রঞ্জুকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয় সে। বেবিট্যাক্সিতে ব'সে দু'পাশের অপস্রিয়মান গাছপালা আর মানুষজন দেখতে দেখতে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে থাকে। অরণ্যে যেভাবে অতর্কিতে প্রেতায়িত অন্ধকার নামে, মনের মধ্যে সেইভাবে রাত্রি নেমে আসে ঝপ করে। অন্ধকারে কুটিল বনাঞ্চলে পথ হারিয়ে ফ্যালে সে, জটিলতা কখনো বাঘ হ'য়ে কখনো পাইথন হ'য়ে ক্রমাগত তার দিকে ধেয়ে আসতে থাকে।

একসময় আবার ভর করে নীলাভাবী।

এক অদ্ভুত প্রস্তাব! খুব সহজে নিতে পারেনা খোকা, আকুলতার চেয়ে আতিশয্যই বেশী এর ভিতর। যদি ট্র্যাপ হয়, জাঁহাবাজ মেয়েমানুষের পাল্লায় প'ড়ে কত ছোকরাই তো ফেঁসে গেল। না কি সাপের মতো পাকে পাকে তাকে জড়াতে চায় কোনো কদর্য অভিষ্ট সিদ্ধির অভিপ্রায়ে। একদিনের একটি দুর্বল মুহূর্তকে মূলধন ক'রে স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে উঠেছে নীলাভাবী; তার ধ্যান-ধারণার স্বাস্থ্য এইভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নীলাভাবী হয়তো নিজের ঠুনকো বিশ্বাসকে এইভাবে দৃঢ় করেছে, তার শরীরের মতো লোভনীয় খোকার কাছে আর কিছুই নেই। কামগন্ধী স্খলনের পিচ্ছিল দুপুরকে মুঠোয় ভ'রে আত্মবিশ্বাসের গজদন্ত মিনারকে গগনচুম্বী ক'রে তুলছে নীলাভাবী।

দেহ কি? শরীর কি?

খোকা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। নারীদেহ সম্পর্কে যতো বিশেষণই প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকনা কেন, আসলে তা নিছক তাল তাল গোবরের মতো মাংস ছাড়া আহামরি এমন কিছু নয়; স্পষ্ট মনে আছে খোকার, সেদিন সেই চরম মুহূর্তের পর কিভাবে গ্লানিতে ভ'রে গিয়েছিলো তার মন। অবসন্নতায়, মনহীনতায়, নিরাসক্তিতে, সে মুমড়ে পড়েছিলো যখন দেখলো সারা গায়ে দুর্গন্ধ নিয়ে প্যাচপেচে ভাগাড় থেকে নেড়ীকুত্তার মতো সে উঠে আসছে।

সবই ভুষিমাল, ঘটনাচক্রে একবার ঘেঁটে দেখেই সে বুঝেছে। গোটা মানব সমাজটাই ভুষিমালের কারবারী, সমজদার। খোকা জানে, এই নীলাভাবীরা তাদের দীর্ঘ বিলম্বিত যৌবন নামক দেহ সম্ভারকে লোকচক্ষুর সম্মুখে যতো মজবুত গদরেজের সিন্দুকেই আগলে রাখার অভিনয়পটুতা দেখাক না কেন, তাদের ঘরের সব দেয়ালই ফুটো, সব দরজাই অর্গলহীন, জানালাগুলো খোলা হাহা।

উদোম রাস্তাও বাইরে থেকে হা ক'রে দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমের এমব্রয়ডারি দেখতে থাকে।

সেই একদিনই, কিন্তু তবু সে তো তন্ন তন্ন ক'রে ঘেঁটে দেখেছিলো সবকিছু। এখন গা শির শির করে ভাবতে গিয়ে। যাকে আমরা দেহ বলি, শরীর বলি, রাজভোগ বলি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ বলি, ঘোড়ার ছাই বলি, আসলে তা নিছক প্রয়োজনের জিনিশ, খোকা ভেবে দেখেছে প্রয়োজন ব্যতিরেকে এক কানাকড়িও তার মূল্য নেই, তার কাছে নেই। ভাতের মাড় গালা মালসা, ঘরমোছা ন্যাতাকানির তাল, কিংবা জঞ্জাল ফেলার আস্তাকুড়, শরীর কি এর অতিরিক্ত কিছু; ডোম-চাড়াল কাওরা-মুচি থেকে শুরু ক'রে কুষ্ঠরোগীরও প্রয়োজনের বস্তু এই শরীর!

হাওয়ায় রঞ্জুর এলোমেলো চুল উড়তে থাকে। ঘাড় মুখ সুড়সুড় করে খোকার। দু'পাশের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোকে তার নীলাভাবী মনে হয়; সেগুন নীলাভাবী, অশ্বত্থ নীলাভাবী, পিপুল নীলাভাবী, কৃষ্ণচূড়া নীলাভাবী, সুঠাম পতিতাশ্রেণী, দেহ বিক্রয় করবে এরা সবাই।

মনে মনে দর কষাকষি করতে থাকে খোকা।

'পিপুল নীলাভাবী, তুমি কতো নাও?'

'তোমার উদ্যম!'

'কৃষ্ণচূড়া নীলাভাবী, তোমার কতো?'

'তোমার রত্নরাজি!'

'অশ্বত্থ, তুমি?'

'তোমার সৃজনশীলতা, তোমার আনন্দ, তোমার স্বপ্ন, তোমার গৌরব, এইটুকুই। আর আমার বখশিস, তোমার ভীষণ চোখ—'

বিতৃষ্ণা কুপোকাৎ ক'রে ফেলে খোকাকে। মনে হ'তে থাকে জীবনে আর কোনোদিন সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে না, তার

মেরুদণ্ডের হাড় চুরচুর হ'য়ে গিয়েছে, ছিঁড়ে জট পাকিয়ে গিয়েছে স্নায়ুতন্ত্রী ; মাথার ভিতরে বেআইনী কারখানা ফেঁদেছে শয়তান, বকযন্ত্রে কেলাসিত হচ্ছে পুঁজরক্তের এক ভীষণ আরক, রাসায়নিক গন্ধে তার নাড়ি ঠেলে আসে।

তবে কি নীলাভাবীর সন্তানের প্রয়োজন তার কাছে? কেন তাকে এভাবে টানছে? সন্তানের পিপাসায় এমন টালমাটাল বল্গাহীন হতে পারে মেয়েরা? বরং একটা যুক্তি হিশেবে ধ'রে নিলে অনেক অসংগতির জট খুলে যায় এতে। নীলাভাবী যদি তাকে সন্তান উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য যন্ত্র ব'লে ধ'রে নিয়ে থাকে, তাহলে সে ভুল করেছে। খোকার মনে পড়ে একজোড়া বিবশ অর্ধনিমীলিত চোখের ছবি, যার ভাষা কোনো অক্ষরে সে পড়েনি এযাবৎ, একটি হাতের বেষ্টন কিভাবে ঠোঁটের নরোম উষ্ণতায় টেনে নিয়েছিলো, ছোবল মেরেছিলো, বিষ ঢেলেছিলো, এইসব ; প্রতিটি নিঃশ্বাস ছিলো তন্ত্রসিদ্ধ আগ্নেয়। গড়ান খেয়ে খেয়ে সে ভৈরবী-চক্রের মাঝখানে গিয়ে পড়েছিলো, কামকুণ্ডের তপ্ত কটাহে নাড়িভুড়ি বিছা আর শিয়ালের রক্তের সঙ্গে সমানে টগবগ ক'রে ফুটেছিলো।

নিজেকে উপপতির সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয় খোকা। ঠিক উপপতিও নয়। সে মনে করে এই বিশেষ্যে কাছাকোঁচা আছে, জুড়িগাড়ি আর বাগানবাড়ি আছে, আতরের গন্ধ খুন-খারাবি আর হীরার নেকলেস আছে। বরং একটা টাইমের বাবু, মাকড়া।

'কি অতো ভাবছিস?' জিগেশ করে রঞ্জু।

'কি করবো তাই ভাবছি।'

'বাপি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও নড়তে পারবো না আমরা, খামোখাই তুই ভাবছিস।'

'ঠিকই বলেছিস।' একটু থেমে খোকা জিগেশ করলে, 'কেমন লাগলো তোর এদের সবাইকে?'

'ভালোই তো—'

'তার মানে তোর পছন্দ হয় নি!'

'পছন্দ-অপছন্দের কি আছে, আমি তো আর তোর জন্যে কনে দেখতে যাইনি। ওরা তো ভালোই, মিশুক—'

'তবু ভালো, তোকে নিয়ে আমি কিন্তু বেশ চিন্তায় ছিলাম। আমি নিজেও ভেবে পাইনা ওদের সঙ্গে আমার এতো খাতির কিভাবে হ'লো, এমন সাদামাটা একটা ফ্যামিলি!'

রঞ্জু খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব নরোম ক'রে বললে, 'তোর উপর যথেষ্ট দুর্বলতা আছে নীলাভাবীর, ভীষণ স্নেহ করেন তোকে। বাপরে বাপ, প্রশংসা শুনতে শুনতে কানমাথা ঝালাপালা হ'য়ে গিয়েছিলো আমার।'

খোকা তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'আরে বাদ দে, আমি এ সব গায়েই মাখিনা। আসলেই নীলাভাবীটা একটা জ্বালাতন, ঝঞ্চাট। নীলাভাবীর সব ভালো, শুধু স্বভাবটা একটু গায়ে পড়া। ছেলেপিলে হয়নি বুঝলি না, এখনো কিছু কিছু ছেলেমানুষি আছে, বুড়িখুকি আরকি!'

'কি যা-তা বলছিস, তোর মাথায় সত্যিই ছিট হয়েছে'—শাসনের সুরে রঞ্জু বললে, 'সবকিছু খারাপভাবে দেখছিস কেন এরকম? মেয়েদের সম্পর্কে ফটাফট মুখে যা আসে তা বলবি না, কি এমন জানিস তুই! কতো স্নেহ করেন তোকে, অথচ যা মুখে আসছে তাই বলছিস, অবহেলার ভাব দেখাচ্ছিস, তুই একটা খেটেচাষা! এই জন্যে মাঝে মাঝে তোর উপর আমার রাগ হয়!'

খোকা অসহায়ের মতো ভেঙে প'ড়ে কাতরভাবে বললে, 'রঞ্জু তুই আজকাল আমাকে বড় বকাঝকা করিস, সামান্য একটা খুঁত

পেলেই হ'লো। আমি তোর দু'চোখের বিষ, দেখতে পারিস না তুই আমাকে—'

রঞ্জু হেসে ফেললো। পোড়া পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ আসছিল ব'লে নাকমুখ রুমাল দিয়ে ঢেকেছিলো সে। রুমালটা দিয়ে খোকাকে একটা বাড়ি মেরে বললে, 'কুচিকোকা কোকাবাবু, কাঁদেনা বাবু কাঁদেনা—'

+

পরদিন খুব সকালে মুরাদ এলো, সঙ্গে ইয়াসিন। খোকা তখন বারান্দায়। ব'সে ব'সে সে পাখির ডাক শুনছিল। এতো পাখির ডাক এর আগে সে আর কখনো শোনেনি। পাতার আড়ালে গা লুকিয়ে চোখগেল আর বউকথাকও ডাকছে এখন।

মুরাদকে কিছুটা বিষণ্ণ মনে হ'লো খোকার। টাকা পয়সার টানাটানি কিংবা গাঁজাভাঙ্গের নেশা, যে কোনো একটার ফেরে পড়েছে বেচারা, খোকা এই সিদ্ধান্তে এলো ; সে জানে অনেকদিন দাওয়াই পড়েনি মুরাদের পেটে, ওর সমস্ত অন্তরাত্মা এখন সাম্‌সু সাম্‌সু ক'রে দাপাচ্ছে।

'খবর শুনেছিস কিছু ?' ইয়াসিন ঠোঁট কামড়ে জিগেশ করে।

'কই আর—'

মুরাদ বললে, 'ও খবর রাখতে যাবে কোন দুঃখে, আমরা তো আছিই মাইনে করা চাকর ; এসে এসে ওকে শুনিয়ে যাবো। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামবে বুঝলি ?'

'তুই জানলি কি ক'রে ?'

'ইকবাল হলের ছেলেরা কানাঘুষা করছে। হল ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে ছেলেরা।'

এখানে আসার একা ছুতো খাড়া করার জন্যে রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামাচ্ছে মুরাদ, সে ভাবলো। বললে, 'নেহাত গুজব—'

মুরাদ চিন্তিত মুখে জিগেশ করলে, 'ঠিক করেছিস কিছু ?'

'না !'

'ইচ্ছে করলে বান্দুরায় গঞ্জালেসের ওখানে উঠতে পারিস। কাছাকাছি হয়—গঞ্জালেস নিজেই প্রস্তাব দিয়েছে।'

'এখনো ওরকম ছুটোপুটি করার সময় আসেনি।'

মুরাদ অপ্রতিভভাবে বললে, 'ব'লে-কয়ে আসবে নাকি সব ? সময় থাকতে ব্যবস্থা না নিলে শেষে পস্তাবি। একটা কিছু হুলুস্থুল শুরু হ'য়ে গেলে তখন আর পালাবার পথ খুঁজে পাবি না, আমরাও কেউ পায়ে ধ'রে সাধাসাধি করতে আসবো না—'

খোকা বললে, 'ভাগার কথা উঠছে কেন, লড়বে কারা ? গাছপালা রাস্তাঘাট লাইটপোস্ট ? আজকের পৃথিবীর স্বাধিকার প্রমত্ত বলবান মানুষেরা ছাদে কেবল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে একচোটে সবাই যদি ভাগোয়াট হ'য়ে যায় সংগ্রাম চালাবে কারা ? ভক্‌কিবাজি !'

'যারাই লড়ুক তারা অন্তত তোর পাঠশালায় পড়া কেউ নয়। তোদের মতো ঝিনুকে দুধগেলাদের নিয়েই যতো ল্যাঠা !'

ইয়াসিন বললে, 'জয়দেবপুরের গোলাগুলির খবর তো শুনেছিসই !'

'শুনেছি কিন্তু ভিতরের রহস্যটা বুঝিনি।'

'অতো বুঝতে গেলে রাত ফর্শা হয়ে যাবে—' ইয়াসিন বললে, 'নিজের মাথা বাঁচাতে চাইলে মানে মানে একদিকে কেটে পড়ো এখনই ! তলে তলে অনেক কিছুই ঘ'টে গিয়েছে, জান নিয়ে টানাটানি শুরু না হ'য়ে যায় শেষ পর্যন্ত !'

'রঞ্জুর কথা ভেবেছিস ?' গভীর গলায় জিগেশ করলে মুরাদ।

'ভেবেছি—'

'কি ঠিক করলি ?'

'ওর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই !'

'ইচ্ছে অনিচ্ছেটা বড় কথা নয় এই সময়। সখ ক'রে তো আর কেউ হাওয়া বদলাতে যাচ্ছে না। তোকেই ইনিসিয়েটিভ নিতে হবে। ঠুঁটোর মতো হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকার সময় এটা নয়। ভেবেছিস খামখেয়ালিপনা ক'রে সবকিছু সামলাতে পারবি ? ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফ্যাল, গঞ্জালেসের ওখানে উঠলে কোনো অসুবিধে হবে না। সুবিধে বুঝলে হুট ক'রে আবার ফিরে আসতে পারবি—'

'তুই কি ঠিক করেছিস ?'

'আমার যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—। মেয়েরা গ্রামে চ'লে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে রঞ্জুকে নিয়ে তুইও যেতে পারিস ওদের সঙ্গে—'

'গালটা ভালোই হ'লো—'

মুরাদ বললে, 'বড়বোনের ঢাকায় থাকার কথা ছিলো, কিন্তু থাকছে না সেও, কারো কাছ থেকে খারাপ কিছু শুনে থাকবে, এখানে থাকাটা আর নিরাপদ মনে করছে না—'

খোকা ইয়াসিনকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে 'তোর খবর কি বল ?'

'খবর কেরোসিন, বিধবা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—'

'দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না ?'

'প্রথম দু'দিন হয়েছিলো, শালার আঁটুলি হ'য়ে লেগেছিলাম সমানে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই পিণ্ডখাড়ু মার্কা এক মামার সঙ্গে কাট্টি মারবে না গ্রামের বাড়ি !'

খোকা হেসে বললে, 'গেরো শক্ত রেখেছিস তো, ফসকে না যায় আবার !'

'কি জানি, লক্ষণ ভালো ঠেকছে না। বিয়েটা পিছিয়ে গেল, দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হলো, শালার কেঁচে না যায় শেষঅব্দি, কতোবারই

তো ভুশুল হলো। এই মেয়েজাতটা বড় অদ্ভুত ! আমরা যে এতো কষ্ট পাই ওরা তা বোঝে না।'

'জিগেশ ক'রে দেখলেই পারিস তোর মিছরিকে, কি বলে !'

'হয়তো শালার মেরেই বসবে, কানপাটি লাল ক'রে দেবে। এতো আর শালার গোপাল উড়ে বড়ু চণ্ডিদাস পড়া ল্যাবেণ্ডিস মেয়ে নয়, এ্যাপলায়েড সাইন্সের ডাকসাইটে ছাত্রী, চাড্ডিখানি কথা নয়—'

'আখের খারাপ তোর, ভট্‌টা করবে তোকে উঠতে বসতে !'

'নিলাম আর কি একটা রিস্ক, যা থাকে ভাগ্যে। সে রকম বেগতিক দেখলে ফুটে যাবো একদিকে—'

খোকা বললে, 'হঠাৎ পিছিয়ে দিলি কেন ডেটটা, তোর বিয়ে তো ল্যাং মেরে, দেশের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কটা কি ?'

'আমি কি আর পিছিয়েছি, পিছিয়েছে ও নিজেই। বোনের এক বাচ্চা ম'রে গেছে, মন খারাপ ; খচ্চরটা পটল তোলার আর সময় পেলো না। বিয়ে-টিয়ে নিয়ে অতো গাবাগাবি ছিল না আমার, আসলে বিয়েটা করা দরকার। বিয়ে না করা পর্যন্ত শুনি ভাগ্যের দরোজা খোলে না। ক'রেই দেখি ক'টা দরজা খোলে। মফস্বলের কলেজে এই পৌনে তিনশো টাকায় পচে মরতে মরতে গা দিয়ে বিটকেল গন্ধ ছুটছে—'

মুরাদ উঠে দাঁড়ায়। ইয়াসিনও। বিভিন্ন ছাত্রাবাসে বমবম ক'রে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের ধান্দায় আছে ওরা ; সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে চায়, খোকা আন্দাজ করে। যে-কোনো আন্দোলন কিংবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হ'লে চর্কিবাজির মতো ঘুরে বেড়ানো পুরানো অভ্যেস মুরাদের, ফলে একটা সুবিধে সে পায় অন্যের মতামতকে হামেশাই নিজের ব'লে চালিয়ে দিতে তার কোনো অসুবিধাই হয়না।

'যা বললাম চিন্তা ক'রে দেখিস। গোঁয়ার্তুমি রেখে মনস্থির ক'রে ফ্যাল।'

উভয়ে বেরিয়ে যায়।

এতোদিন পর বাড়ি ছাড়ার সমস্যা নিয়ে সত্যিই মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে খোকা। বাপির পিণ্ডি থেকে না ফেরা অবধি যে ক'রেই হোক অপেক্ষা করতে হবে। তারিখ পার হ'য়ে গিয়েছে কয়েকদিন আগেই, কোনো চিঠিপত্রও আসেনি এর মধ্যে, অস্বাভাবিকতা নেই তো এই নীরবতায়! বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক রঞ্জু, তার নিজেরও উৎসাহ নেই তিলবিন্দু, কিন্তু একথাও সত্যি, যে হারে শহরের মানুষজন গ্রামের দিকে ছুটছে তাতে শেষ পর্যন্ত মনের দৃঢ়তা চিড় খেয়ে যাবে বলেই তার বিশ্বাস। মুরাদের মতো মানুষজন স্রেফ বানোয়াট পরিস্থিতির গালগপ্পো ফেঁদে ধীরে ধীরে উন্মত্ততার দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে, এসবও অল্পবিস্তর সত্যি। বাংলা নিয়ে পাশ ক'রে একেবারে গাব্বুতে প'ড়ে গিয়েছে বেচারা, ছেঁড়া চটিজুতোর মতো অবহেলাভরে এক-পাশে প'ড়ে আছে। বাঙালীদের অধিকার, মানে মুরাদের চাকরি; বাংলা নিয়ে পাশ করার দল হাতে মোয়া পাবে। দশজোড়া ক'রে গোঁপ গজাবে ওদের। মুরাদের উৎসাহের মূল কারণ এইসব, খোকা জানে।

রঞ্জুর ভালোমন্দ নিয়ে মাথাব্যথার আর শেষ নেই মুরাদের। কি বোঝাতে চায় মুরাদ। ইয়াসিনের সামনে এমনভাবে রঞ্জুর কথা পেড়েছিলো যেন কতোদিনের সম্পর্ক ওর রঞ্জুর সঙ্গে। রঞ্জুর ব্যাপারে এই প্রবল উৎসাহের পিছনে যুক্তিটা কি খোকার তা বোধগম্য নয়। সহ্যের সীমা পার ক'রে দিচ্ছে মুরাদ, ওকি শেষ দেখতে চায়?

এ এক ধরনের শত্রুতা। ভিতরে ভিতরে একটা কিছু পাকাচ্ছে কিনা তা-ই বা কে বলবে, নির্লজ্জ বেহায়া, মতলব কি ওর! রঞ্জুর

ভালোমন্দ নিয়ে আকাশ ভেঙে পড়ছে ওর মাথায়। কে ওকে অধিকার দিয়েছে? পাত্তা না পেয়ে ভিন্ন পথে হিশেব ক'রে এগোতে চায় মুরাদ। মরিয়া হ'য়ে উঠছে জানোয়ারটা; ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে খোকার মাথা। সে দিশাহারা হ'য়ে পড়ে একসময়।

খোকা পায় পায় রঞ্জুর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নখ কাটতে বসেছিলো রঞ্জু।

'আমার কাছে দে—' নেলকাটার নিয়ে নেয় খোকা, 'পা বাড়িয়ে দে দেখি এদিকে।'

কুট কুট ক'রে রঞ্জুর পায়ের নখ কাটতে থাকে খোকা। রঞ্জুর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। রুপোর তোড়া পায়ে ঘরময় ঝুমঝুম ক'রে ছুটে বেড়াতো রঞ্জু, শখ ক'রে মা পরিয়েছিলো। কি ছিচকাঁছনেই না ছিলো সে সময়। তাকানো যেতো না ওর দিকে, সব সময় ছাখো ঠোঁট ফুলিয়ে আছে, ছলছল করছে চোখজোড়া; যেন কতো না ওর ছঃখ, ছনিয়ার সবাই বিরাট এক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে ওর কাঁধে।

নখ কাটতে কাটতে ওর পায়ে ছোট্ট একটা চাপ দিলো খোকা, বললে, 'এই বাঁদরী, ছোটোবেলায় টমেটো বললে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ভাসাতিস কেন রে?'

'বললেই হ'লো!'

'তোর বোধহয় মনে নেই।'

'ফাঁক পেলেই তুই আমার কান ম'লে দিতিস, আর আমি মার কাছে নালিশ করতাম—'

'তখন তোর কানজোড়া বেজায় ছোটো ছিলো, টেনে টেনে আমিই লম্বা করেছি!'

'গুলবাজ! নিজের কথা মনে নেই তোর? বুড়ো ধামড়া হয়েও

১১—

তুই বিছানায় পেচ্ছাব করতিস। একবার তোকে কাপে ক'রে পেচ্ছাব খাওয়ানোও হয়েছিলো, মার মুখে তোর সব কেচ্ছাই আমি শুনেছি!'

'আর কেন্নো দেখলেই তুই যে চিংড়ি ভেবে গপ্ ক'রে গালে পুরতিস, তারপর ক্যাঁচম্যাঁচ ক্যাঁচম্যাঁচ চিবিয়ে খেতিস—'

'ইশ, সত্যি বলছিস দাদা ?'

'তবে কি ? গাল ফুলে যেত, জিভ ফুলে যেত, চুন লাগিয়ে দিতো মা। তুই কি কম জ্বালিয়েছিস মাকে ?'

'আহা, নিজে কতো লক্ষ্মী ছেলেটিই না ছিলে! হ্যাড়ারাজা মার্কা গিনি দিয়ে চিনেবাদাম কিনে খেয়েছিলো কে ? কেমন পিটুনি পড়েছিলো পিঠে ? এমন গবামার্কা ছিলি যে ইস্কুলের ক্লাসে ব'সে ব'সে গাল বন্ধ ক'রে খোসাসুদ্ধু চিনেবাদাম খেতিস, যাকে বলে একদম গাধা!'

'তোর পায়ে একবার কাঁকড়াবিছে কামড়েছিলো, মনে আছে ?'

'ইশ্, সেকি হুলুস্থূল কাণ্ড! মা ফিট হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলো, ভেবেছিলো বুঝি সাপে কামড়েছে!'

অনেকক্ষণ পর খোকা বললে, 'তোর ভয় করছে ?'

'তোর ?'

'তোর জন্যে আমার ভয়। চল কোথাও রেখে আসি তোকে—'

রঞ্জু হেসে বললে, 'পায়ের নখ কেটে দেবে কে তাহলে ?'

'সময় হ'লে আমি কেটে দিয়ে আসবো।'

'আমাকে কাটাতে পারলে তোর বোধহয় মস্ত সুবিধে হয়, তাই না ? ইচ্ছেমতো খোকামি ক'রে বেড়াতে পারবি—'

'একশোবার—'

'বুড়োধাড়ি হ'লেও এখনো তুই নিজেকে খোকা মনে করিস, এটাই তোর দোষ!'

'আর তোর দোষ কোনটা জানিস, ওর উল্টোটা। একফোটা পুঁচকে ছুঁড়ি তার আবার এতো কথা কিসের ?'

খুব সাবধানে নখের ধার মারতে থাকে খোকা ফাইলিং ক'রে। খোকার মনে হয় এইতো সেই রঞ্জু, এ আমার কতো চেনা, রুপোর তোড়াপরা ঝুমঝুমি বাজানো ছোট্টবেলার সেই রঞ্জু; মুরাদ একে চেনে না, কাব্যচর্চার ঘোড়ারোগ দিন দিন বানোয়াট ক'রে তুলেছে তাকে। রঞ্জুর স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে খোকা স্বস্তি পায়, সুস্থ হয়; এমন স্নিগ্ধ এমন নির্মল এমন নিষ্কলঙ্ক হ'তে পারে কেবল করুণাধারা।

+

খোকা ঠিক করেছে দুর্যোগ নিয়ে সে আর মাথা ঘামাবে না। সে দেখেছে এতে তার ভিতরের অশান্তি দ্বিগুণতর বাড়ে। জনসভা আর মিছিল ক'রে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার জন্যে কোমর বেঁধে উঠে প'ড়ে লেগে গিয়েছে মানুষজন। কাঁধে রাইফেলের কেঠো ডামি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কুচকাওয়াজ ক'রে বেড়াচ্ছে উৎসাহী ছাত্রদল। সেনাবাহিনীর লোকজন ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। হ্যাবলা-গোবলা বাঙালী সেপাই-সান্ত্রীরা চোখে মুখে 'ভাই ভাই' ভাব নিয়ে প্রাণের আনন্দে ট্রাকে ট্রাকে ঘুরে নামকে ওয়াস্তে পাহারাদারি ক'রে বেড়াচ্ছে; হাবভাব দেখলে মনে হয় হাতে কল্কে এসে গিয়েছে, এখন কেবল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো।

বিকেলে আউটার স্টেডিয়ামে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলো খোকা। দেখা হ'লো রহমান আর নুরুদ্দিনের সঙ্গে। রহমান উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, 'খেলা জ'মে গেছে, এবার শালার, বোম ফেলাট হ'য়ে যাবে—'

ময়দানে এখানে ওখানে জটলা। কোনো একজন বক্তা বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলছে, 'ভাইসব, সময় নষ্ট করবেন না,

আপনারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুন, আজ আপনাদের সম্মুখে কেবলমাত্র একটি পথই খোলা, সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। কালবিলম্ব না ক'রে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে আপনাদের, আঘাত হানতে হবে শত্রুকে। এতোদিন যে বিপ্লবকে মনে হয়েছিলো পর্বতের মতো ভারী, আজ তা পালকের চেয়েও হালকা, মুক্তির একমাত্র পথই হ'লো সশস্ত্র বিপ্লব, এই পথই বেছে নিতে হবে আপনাদের—'

'লে ধড়ফড়াকে!' জনসভার বাইরে বাঙ্‌ দিয়ে উঠলো একজন।

স্টেডিয়াম গেটের পাশে টিকিট ঘরের ছাদে আসন গেড়ে ব'সে ফুকফুক ক'রে সিগ্রেট ফুঁকছিলো ছাত্রনেতারা। ময়দানের মানুষজন হুড়মুড় ক'রে ছুটে এসে জমায়েত হ'লো সেখানে।

খোকা দেখলো জনৈক ছাত্রনেতা কোমরে একটি হ্যাণ্ডেল লাগিয়ে এবং অপর একটি হাত স্প্রিং-এর মতো নেড়ে নেড়ে অনর্গল তুবড়ি ছোটাচ্ছে 'এরা কারা? আপনাদের মতো আমাদেরও ওই একই প্রশ্ন, এরা কারা? জনতা এদের চেনে? এদের কি কোনো পরিচয় আছে জাগ্রত জনতার সঙ্গে? পরিচয় নেই। জনতা এদের চেনে না। এরা বিবরবাসী। মুক্ত আলোবাতাস থেকে বঞ্চিত এইসব হতভাগ্য অভিশপ্তেরা। জনসাধারণের সঙ্গে এদের কোনো সংশ্রব নেই, দেশের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিছুসংখ্যক বিপথগামী উন্মাদ। সস্তা বিপ্লবের ধুয়ো তুলে এই হঠকারির দল মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে আপনাদের। আমি হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চাই—'

একফাঁকে স'রে পড়লো খোকা। দিনের পর দিন সকাল বিকেল দুপুর চিরতার পানির মতো এইসব গিলছে উৎসাহীর দল; ভগ্নোদ্যমকে সেঁকে নিচ্ছে। ফাঁপা আস্ফালন ও বাঁধাগতের বুলি আওড়ানো, আর কিছু শেখেনি এরা এর বাইরে। দেশের বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির সত্যিকার চেহারা কোনো বক্তৃতাতেই নেই,

এদের ঘৃণা করে খোকা, এরা লোভী ধূর্ত শঠ প্রবঞ্চক, সমগ্র দেশের রুচিকে এরা বিকৃত ক'রে তুলেছে।

পা ঘষাঘষি করতে করতে শেষ পর্যন্ত নীলাভাবীদের ওখানে গেল খোকা। রাজীব ভাই বাইরে। নীলাভাবী বললে, 'নিতে এসেছো?'

'এখনো ইচ্ছে আছে?'

'তার মানে?'

'আমি ভেবেছিলাম কথার কথা।'

'এতোকিছুর পরও?'

'এতোকিছু আবার কিসের, টেকনিকটা তো পুরানোই—'

'বাজেকথা ব'লো না, নিয়ে যাবে কিনা বলো?'

বিছানায় গা এলিয়ে দিলো খোকা। দুটো বালিশ টেনে ঘাড়ের নিচে চালান ক'রে হেসে বললে, 'যদি তুমি আমার মাথা চিবিয়ে খাও—'

'খাবোই তো!'

'আসল কথা তোমাকে নিয়ে ভাগতে পারবো না!'

'খারাপ কথা বলবো কিন্তু!'

'এ আর নতুন কি—'

নীলাভাবী খোকার হাত চেপে ধরলো। বললে, 'ভেবেছো ঠাট্টার ছলে সব উড়িয়ে দেবে, আমি সব বুঝি, উত্তর তোমাকে দিতেই হবে, ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।'

খোকা গা ছেড়ে দেবার ভঙ্গি ক'রে বললে, 'আমি তোমার কে? আমার উপর এতো অধিকার খাটাতে চাও কেন? আমি তোমার মুটেমজুর নই, কোনো বোঝা নিতে পারবো না, সাফ কথা!'

'আমি কি সত্যিই বোঝা? কি ক'রে বলতে পারলে?'

'তুমি সিনেমায় নামোনা কেন?'

বিছানার এক পাশে ব'সে খোকাকে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে দিলো নীলাভাবী। বললে, 'আমি বুঝতে পারছি নিজের উপর তোমার তিলবিন্দু আস্থা নেই। সে না হয় হ'লো, এতো ভয় পাচ্ছো কেন, আমি বাঘ না ভাল্লুক, তোমাকে বুঝি গিলে খাবো ?'

'অসম্ভব কিছু নয়। নিজের উপর আস্থা থাকলে অসময়ে এই বান্দাকে সেগুনবাগিচায় কোনো শালা দেখতো না। আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি তুমি আমাকে যাদুটোনা করেছো, পান-সুপুরি ছেড়েছো, তোমার মতলব খারাপ !'

নীলাভাবীর চোখমুখ দপ্ ক'রে উঠলো একথায়। বললে, 'মাঝে মাঝে তুমি এমন কদর্য কথা বলো ! আগে তো এমন ছিলে না। এসব নোংরা ইয়ার্কি তুমি অন্য কোথাও মেরো, আমার কাছে না !'

নীলাভাবীর একথায় তেজ ছিলো। এই তেজ খোকাকে স্পর্শ করে। এই তেজ খোকাকে তার নিজের মতো ক'রে পথ দেখায়। শেকড়বাকড়হীন এই সমস্যাকে এখানেই এই মুহূর্তে শেষ ক'রে দিতে হবে, তাকে নেবার প্রশ্ন যেন আর কোনোদিন মাথা তুলে চাড়া না দেয়, খোকা আলো দেখতে পায়। সে উঠে ব'সে বললে, 'ভণিতা ছেড়ে সোজা রাস্তায় এসো, কি চাও কি তুমি, কেন এ খেলায় মেতে উঠেছো ? রসাতলে নিয়ে যেতে চাও বুঝি আমাকে ?'

নীলাভাবী স্তম্ভিত হ'য়ে দীর্ঘ দৃষ্টিতে খোকার দিকে তাকালো।

খোকা বললে, 'তুমি নিজেকে শাসন করো, অশ্লীলতা বিকৃতি স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংস ক'রে দেবে তোমাকে ; এভাবে ছত্রাখান কোরো না নিজেকে। আমি তোমার ভালো চাই, আমি তোমার বন্ধু ! যদি বলো চিরকাল বন্ধু থাকবো, আমি চাইবো তোমার ভালো হোক। নিজের হাতে তোমাকে নষ্ট করবো ভাবো কি ক'রে, আমার ভিতরে শুধু লাম্পট্যই দেখলে—'

'কাকে ভালোমন্দ বলছো? তোমার কাছে শিখতে হবে ভালোমন্দ?'

'সে তোমার ইচ্ছে! আমি শুধু বলছি আমার অক্ষমতার কথা। আমি যা পারবো না আমার কাঁধে তা চাপাতে যেও না!'

'তার মানে আমি তোমার কাছে দয়ার কাঙাল!'

'তুমি ইচ্ছে ক'রে এইভাবে দেখছো—'

'কিভাবে আমার স্বেচ্ছাচারিতাকে দেখলে, বিকৃতিকে চিনলে?'

'কথা ঘুরিয়ো না। আমি যা বলছি তুমি তা বুঝেছো। ভাণ কোরো না না-বোঝার। আগুন ঘাঁটাঘাটি কোরো না, হাত পুড়ে যাবে, মুখ ঝল্‌সে যাবে। তুমি যে সুখশান্তির কথা ভাবো সারা ছুনিয়া চ'ষে বেড়ালেও তা কখনো কেউ পাবে না, এ আমি জানি। শান্তি রচনা করতে হয়। নিজেকে সংযত করো, নিজেকে শাসন করো—'

'চমৎকার! থামলে কেন, বলো, আরো বলো!'

'বলবো না কেন, তুমি আমাকে বলাচ্ছো। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বাহাছুরি নেবার চেষ্টা ক'রো না। যেদিন তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেদিন তোমার ভিতর এ বিকৃতি ছিলো না; কতো স্নিগ্ধ ছিলে তুমি, আমার কাছে সেটাই ছিলো তোমার আকর্ষণ। ভেবে ছাখো, আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছো, কি ভাবে মান সম্মান আত্মগরিমাকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছো—'

'তাহলে আমি এই?'

'হ্যাঁ, তুমি এই; তোমার সুবুদ্ধি নেই, সংযম নেই, হিতাহিতজ্ঞান নেই, আত্মশাসন নেই, ভেবে দেখেছো কখনো এর শেষ কোথায়?'

'বুঝতে পারছি খুব বেশী আশা ক'রে ফেলেছি আমি তোমার কাছে!'

'এখন দেখছো একজন প্রতারক, এই তো?'

‘বুঝতে পারি না। তোমার মতো এতো সহজে আমার মাথায় কিছু ঢোকে না। কোনটা ভণ্ডামি আর কোনটা ভালোমানুষি সেটা তুমিই জানো। শুধু বুঝতে পারছি আমার চরিত্র নেই, চরিত্রকে হাটে-বাজারে বন্ধক দিয়েছি, লজ্জায় তোমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে!’

‘আছে কি নেই সেটা তোমার ভাবনা। থাকলে ভালো হয়, এটাই সত্যি। তুমি একটা সামান্য মেয়েমানুষ, কিন্তু জুয়ায় দান দেবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছো। মানুষের সংসারে বাস করা উচিত, না ভাগাড়ে?’

‘খাতায় নাম লিখিয়েছি, এই বলতে চাও তো?’

‘তুমি চাও না, সত্যি ক’রে বলোতো, তুমি চাও না আমি তোমার ভিতর যুঁইফুল ফোটাই?’

খোকার কথা শেষ না হতেই প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় পড়লো তার গালে। বিছানার উপর ট’লে পড়লো খোকা। চোখে আঁচল চেপে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলো সে নীলাভাবীকে।

এই ভালো,—গালে হাত বুলিয়ে আরাম পেল খোকা!

খুব ভালো হ’লো, এই চড়ের কথা জীবনভর যেন আমার মনে থাকে, মনে রাখবে তো খোকা? ভাই আমার, মনে রেখো!

ভালোই লিখেছিলো বেলী। বেলী লিখেছিলো, তোমাকে তো পারেনি, তাই তোমার একলা বিছানাটাকে তছনছ ক’রে দিলো বেলী। একদিন এই গালে নীলাভাবীর ঠোঁটজোড়া তার সুখশয্যা রচনা ক’রে বিশ্রাম নিয়েছিলো; আমাকে পারেনি, তাই তছনছ ক’রে দিয়েছে আমার গাল।

ভালোই লিখেছিলো বেলী। বেলী লিখেছিলো, কেন লেখো, কেনই বা ধ্বংস করো; নীলাভাবীকে উস্কে দিয়েছিলাম আমিই, আবার আমিই তাতে পানি ঢেলে দিয়েছি।

খোকা ভাই আমার, আমার এ গাল বড় আদরের, বড় যত্নের,

জীবনভর মনে রেখো, থাপ্পড় পড়েছে আমার এই গালে, আগুনের শিখার মতো পাঁচটা আঙুলের দাগ বসেছে এই গালে। বলো লজ্জা লজ্জা লর্জ্জা! বলো ঘৃণা ঘৃণা ঘৃণা! বলো কি অশ্লীল এ দাগ!

আর লিখো না, দলামোচড়া ক'রে ছুড়ে দিও না খাটের তলায়। অনেক লিখেছো, অনেক ধ্বংস করেছো, ঢের হয়েছে, এখন তোমার খেলা বন্ধ করো, খোকা, ভাই আমার, চেয়ে ছাখো কি ক্লান্তি! কি বিতৃষ্ণা!

সন্ধ্যা পার হ'য়ে রাত্রি গড়িয়েছে সেই কখন। কিছুই জানেনা খোকা। তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো সে পড়েছিলো; ডিমের খোলের ভিতর একটু একটু ক'রে সে প্রাণ সঞ্চয় করছিলো। সে জানে, আজ তার নবজন্ম হয়েছে। আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে, তার আর কোনো সমস্যা নেই, সমস্যার পীড়ন নেই, সবকিছুর সমাধান ক'রে ফেলেছে সে।

ঘরে ফিরে জামার বোতাম খুলতে খুলতে রাজীব ভাই বললে, 'শুনলে কিছু?'

'কই না।'

'শুনলাম সব কিছু মিটমাট হ'য়ে গেছে।'

'কিছুই শুনিনি!' খোকা অপরাধীর মতো স্বীকারোক্তি করলে।

'ইয়াহিয়া-ভুট্টো নাকি ছ'দফা মেনে নিয়েছে। টেলিগ্রামও বেরিয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় ভিড়, এখন কেবল রেডিও টেলিভিশনে সরকারি ঘোষণার অপেক্ষা—'

'রক্তারক্তিটা তাহলে এড়ানো গেল শেষ অব্দি!'

'কি জানি, হয়তো শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে শয়তানগুলোর। এ ছাড়া আর কোনো পথ তো ছিলো না, দেখাই যাক!'

হাতমুখ ধুয়ে এসে রাজীব ভাই বললে, 'কথা হয়েছে নীলার সঙ্গে? যা ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিলো আমাকে। তোমার অসুবিধের

কথা আমি বুঝি, বুঝলে কি হবে, এমন গোঁ ধ'রে বসেছে বাধ্য হ'য়ে তোমাকে বলতে হ'লো। এখন বোঝানো যাবে। তুমি বোধহয় অব্যাহতি পেলে।'

খোকা উঠি উঠি করায় রাজীব ভাই বললে, 'আরে বোসো বোসো, যাবেই তো, এসো একহাত হ'য়ে যাক আজ—'

দাবার বোর্ড আর গুটি বের করলে রাজীব ভাই। খোকার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ মনে হলো। কিছুটা ধারালো রাজীব ভায়ের মুখ। হুট ক'রে দাবার বোর্ড টেনে বের করাকে খুব সহজে নিতে পারে না খোকা।

কয়েক চালেই হাতি আর মন্ত্রীর যৌথ আক্রমণ রচনা করলো রাজীব ভাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুলকি চালে ঘোড়াও এসে জুটলো। ভীষণভাবে আক্রান্ত হ'য়ে গেল খোকা। রাজা সামলাতে গিয়ে এক এক ক'রে বহু গুটি হারাতে হ'লো তাকে; তারপর সামান্য একটু অসতর্কতার সুযোগে ঘোড়ার চালে কিস্তি দিয়ে তার শেষ শক্তি মন্ত্রীকেও ছোবল দিলো রাজীব ভাই। রিজাইন দিয়ে মুখ রক্ষা করলো খোকা।

পরের বার খুব ধীরে-সুস্থে চাল দেওয়া শুরু করলো রাজীব ভাই। খোকার দৃষ্টি এড়ায় না খুব ঠাণ্ডা মাথায় বোড়ের জাল বিস্তার ক'রে অসাধারণ নিপুণতায় আক্রমণের পরিকল্পনা ফেঁদে চলেছে ভদ্রলোক। খোকাও শক্ত দেয়াল তুলে দিলো এক এক ক'রে। রাজাকে দুর্গের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত রেখে শত্রুপুরীতে ঘা দেবার জন্যে হাতির রাস্তা পরিষ্কার ক'রে ফেললো। প্রথমে সংঘর্ষটাকে কেন্দ্রস্থলে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্যোগ নিলেও অজ্ঞাত কোনো কারণে তা বাতিল ক'রে একপাশ থেকে একটা বোড়ে ঠেলে দিলো রাজীব ভাই খোকার হাতির পথে, খোকা মনে মনে হাসলো, সে জানে বোড়েটা বিষাক্ত নীলাভাবীর চেয়েও। সে লোভ সংবরণ করলে। এবারে

একটা কালো ঘোড়া সামনে দিলো, বিধ্বংসী টোপ, খোকা লোভ সংবরণ করলে এবারও। সে লক্ষ্য করে, এই টোপ না গেলার ফলে রাজীব ভায়ের সমস্ত গুটির অবস্থান ঢিলে হ'য়ে পড়েছে। ইচ্ছে মতো খোকা এখন রাজাকে ন্যাংটো ক'রে নাচাতে পারে, কান ধ'রে টেনে আনতে পারে। না, উচিত হবে না, খোকা মত বদলে ফেললে। উচিত হবে না রাজীব ভাইকে হারানো। যেমন ক'রেই হোক জিতিয়ে দিতে হবে ভদ্রলোককে। যথেষ্ট মার খাচ্ছে বেচারা ভিতরে ভিতরে, খুব করুণ মনে হ'লো খোকার। শেষ পর্যন্ত এ খেলায় সে ইচ্ছে ক'রেই জিতিয়ে দিলো রাজীব ভাইকে।

'এটা শেষ গেম। তুমি কিন্তু তেমন মনোযোগ দিয়ে খেলছোনা। এ গেমটা তোমার ছিলো!'

'জেতার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই খোকার। চোখে ধুলো দেবার জন্যে কিছুক্ষণ সে আস্ফালন করলো। বিচ্ছিন্নভাবে এধারে ওধারে ব্যর্থ আক্রমণ চালালো; জোরালো পরিকল্পনা না থাকায় তার সবকটি আক্রমণই অতি সহজে প্রতিহত ক'রে ধীরে ধীরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে রাজীব ভাই। অব্যাহত চাপের মুখে ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে খোকা। ঠিক এই সময় নিঃশব্দে আলো নিভে গেল।

চট ক'রে জানালার পাশে স'রে এলো খোকা। ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে, গোটা শহরেই নেমেছে প্রেতায়িত অন্ধকার।

'কি ব্যাপার?' কান পাতার চেষ্টা ক'রে রাজীব ভাই বললে, 'শ্লোগান শুনতে পাচ্ছো?'

একদল তরুণ হুটোপুটি ক'রে ছুটতে ছুটতে রাজীব ভাইদের পাশের বাড়িতে ঢোকে।

'কি ব্যাপার?' প্রতিবেশিদের একজনকে ডেকে জিগেশ করলে রাজীব ভাই।

'ট্রাক কি ট্রাক আর্মি নামছে রাস্তায়!'

'কি সর্বনাশ!' খোকা ভেঙে প'ড়ে বললে, 'এখন উপায়। ঘরে ফিরবো কি ক'রে?'

'ব্যস্ত হ'য়ো না, আগে ব্যাপারটা বুঝতে দাও—'

সামনের রাস্তায় বেরিয়ে একজন তরুণের মুখ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সম্ভবমতো যাবতীয় পরিস্থিতির কথা জেনে নিতে থাকে রাজীব ভাই।

খোকা মরিয়া হ'য়ে বললে, 'যেতে আমাকে হবেই, যে ক'রেই হোক, ঘরে রঞ্জু একা—'

'অসম্ভব!' রাজীব ভাই খোকার একটা হাত ধ'রে বললে, 'যাবে কি ক'রে? খুব ভুল হ'য়ে গিয়েছে, আমার উচিত হয়নি তোমাকে এভাবে ধ'রে রাখা। এখন সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। চারিদিকে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হ'য়ে গিয়েছে। ওরা বলছে সৈন্যরা সমস্ত ছাত্রাবাস আর পুলিশ লাইন ট্যাঙ্ক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে।'

'কিন্তু রঞ্জু—'

অচৈতন্যপ্রায় খোকা থপ ক'রে ব'সে পড়ে মেঝের উপর, চোখে অন্ধকার দেখে সে।

রাজীব ভাই খোকার পিঠে একটা হাত রেখে বললে, 'শক্ত হবার চেষ্টা করো। এভাবে মুষড়ে প'ড়ে কোনো লাভ নেই। আমি বেরিয়ে দেখছি এখনো কোনো উপায় আছে কিনা।'

মুখের কথা প্রায় মুখেই থেকে যায়, চতুর্দিকে মুহুর্মুহু প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ফেটে পড়তে থাকে। প্রাণভয়ে ভীত রাস্তার মানুষজন আত্মরক্ষার জন্যে যেদিকে পারছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে এলোপাথাড়ি হুদ্দাড় ক'রে ছুটে পালাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে কে একজন চিৎকার ক'রে বললে, 'সাবধান ভাই সব! আপনারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকুন! সৈন্যরা পাগল হ'য়ে গেছে! কুত্তার বাচ্চারা গরু ছাগলের মতো মানুষ মারছে এখন!'

খুব কাছাকাছি হড়াম ক'রে একটা মর্টারের শেল এসে পড়লো।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে গোটা বাড়ি থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। বৃষ্টির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে। ধরাশায়ী মানুষজনের চিৎকার-আর্তনাদে দ্রুত নারকীয় পরিস্থিতি নেমে আসে চতুর্দিকে। জানালার পাল্লা ভেদ ক'রে উপর্যুপরি কয়েকটি বুলেট দেয়ালে এসে পড়ায় ঝুরঝুরিয়ে পলেস্তারা খ'সে পড়ে। এক অলিখিত নিয়মে হামাগুড়ি দিয়ে সকলেই খাটের তলায় আশ্রয় নিলো। হাত-পা পড়ে গিয়েছে খোকার। চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে। তার মাথার খুলির ফোঁকরে ভয়ংকর এক শূন্যতায় লেলিহান অগ্নিশিখার মতো করাল মৃত্যু লকলকে জিভ বের ক'রে অবিরাম ভয়াবহ অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে থাকে।

+

তারপর দুটি রাত, মাঝখানে একটি দিন,

খোকা জানেনা কিভাবে সময় কেটেছে। কোনো হিশেব নেই তার কাছে। কেবল এইটুকু মনে আছে, অনৈসর্গিক আচ্ছন্নতার ভিতর জুবড়ে থেকেও সে অনুমান করতে পারছিলো কি পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা চলেছে শহরময়। জানালার ফাঁকে চোখ রাখলেই দেখা যায় চতুর্দিকে ছত্রাখান মৃতদেহ, ছিন্নভিন্ন, ঝাঁঝরা : শহর জুড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে আগুন, তপ্ত বাতাসের হলকায় দগ্ধ মাংস আর বারুদের কটু গন্ধ।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিলো দেয়াল। জানালার সামনে একটা খাট খাড়া করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো রাজীব ভাই, গুলি লাগলো মুখে।

ঠিক কখন রাজীব ভায়ের মৃত্যু হয়, খোকার তা জানা নেই। অন্ধকার প্রেতপুরীতে তিনটি জড়বৎ প্রাণী রুদ্ধশ্বাসে কেবল প্রহর

শুনেছে। সবকিছু আয়ত্তে এলেই ঘরে ঘরে ঢুকে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালাবে উন্মত্ত সৈন্যদল, একটি প্রাণীও বাঁচবে না, এই এখনও যেমন কুকুর-বিড়াল সামনে যা পড়ছে তোপের মুখে উড়িয়ে দিচ্ছে এক ধারসে,—থেকে থেকে এইসব ভেবে শিউরে উঠছিলো খোকা।

সকালের আলোয় রাজীব ভায়ের মুখ দেখে তার রক্ত হিম হ'য়ে গিয়েছিলো, মনে হয়েছিলো নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, বিকৃত তিরস্কার। গুলিতে রাজীব ভায়ের মুখের একপাশের চোয়াল উড়ে গিয়েছিলো !

সন্ধ্যার আগেই শুরু হয়েছিলো মুখের দিকে পচানি ধরার। অনির্দিষ্টকালের জন্যে কারফিউ, কোনো প্রশ্নই ওঠেনি সৎকারের। প্রতি মুহূর্তেই গোলাগুলির তুমুল শব্দ, মাঝে মাঝে দুরে কোথাও ঘটছে উচ্চণ্ড বিস্ফোরণ , ব'সে ব'সে নিজের মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া কারো কিছুই করণীয় ছিলো না।

এই প্রথম জীবনের চেয়েও বড় ব'লে মনে হয়েছিলো এক একটি রাত্রিকে ; বিস্ফোরণের শব্দ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছিলো প্রতিটি পল অনুপলকে। জীবনের অর্থ তখন একটাই,—প্রাণের ভার ; নারকীয়তার এমন রুদ্রমূর্তি আর কখনো দেখেনি খোকা।

ক্রমাগত ফুলছিলো রাজীব ভায়ের লাশ। এক বিকট গহ্বরে ঠেলে বেরিয়ে আসছিলো ক্ষত-বিক্ষত জিভ। যাবতীয় ধ্বংসস্তূপের ভিতর এই মানুষটিই সবচেয়ে বেশী অনাত্মীয় হ'য়ে উঠেছিলো তিনটি প্রাণীর কাছে ; কেননা রাজীব ভায়ের লাশের গন্ধে সকলেরই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো।

+

খোকার গল্পের এখানেই সমাপ্তি।

নুরুদ্দিন, মণ্ডলা, মুরাদ, বেলী, নীলাভাবী কিংবা রাজীব ভায়ের পরিচিত সেই খোকা সম্পর্কে এই ঘটনার পর বলবার মতো আর

কী-ই বা এমন থাকতে পারে! দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এমন এক সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভিতরে গিয়ে পড়েছিলো যে খোকা নিজের কাছে নিজেই বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিলো না।

দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত জ্বলেছিলো সর্বগ্রাসী আগুন। উন্মত্ত সৈন্যরা দেশকে ধ্বংসস্তূপ কিংবা শ্মশান তৈরির পরিকল্পনায় নৃশংস বর্বরতার চরম পথই বেছে নিয়েছিলো। দেশের বিরাট একটি অংশ লাল মরণোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মুক্তিযুদ্ধে।

মুরাদ, রহমান, এমন কি ইয়াসিনও মুক্তিযোদ্ধা হ'য়ে লড়াই করেছে। রহমান নিহত। ইয়াসিন পঙ্গু। গেরিলা কমাণ্ডার মুরাদের বীরত্বের খ্যাতি গোপনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

খোকার গল্পের এইখানেই সমাপ্তি, কেননা খোকা এমন কিছুই করেনি যে ইতিহাসের পাতায় তার নাম থাকবে। মুমূর্ষু বাঙালী জাতি ইতিহাস তৈরির নেশায় মেতে উঠেছিলো; এক পলায়ন ছাড়া সেখানে খোকার কোনো ভূমিকা নেই, ইতিহাসের ধূসর আড়ালে খোকারই তো প্রথম মুখ লুকোবার কথা।

দু'দিন পর কয়েক ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব ভায়ের লাশ ফেলে বাড়িতে ছুটেছিলো সে, এবং রঞ্জুকে পেয়েছিলো।

কিন্তু তারপর? খোকার নিজেরই এখন আর সবকিছু হুবহু মনে নেই। কেবল অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রাণভয়ে ভীত হাজার হাজার নরনারীর সঙ্গে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছিলো সে; প্রতিটি গাছের ছায়া তখন এক একটি বিরাট অট্টালিকা সেখানে।

আর্মি ক্র্যাকডাউনের প্রথম রাত্রেই বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো রঞ্জু। গাছের নীচে শতরঞ্চি বিছিয়ে তাকে শুইয়ে রেখেছিলো খোকা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থৈ থৈ মানুষ, যে যার নিজের

পারিবারকে, নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। এই অবস্থায় হলো তুমুল ঝড়, সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি।

বৃষ্টিতে ভিজে সেই রাত্রেই জ্বর এসেছিলো রঞ্জুর। মাথা ঠিক ছিলো না খোকার। বুদ্ধি লোপ পেয়েছিলো, কি করবে, কি করা উচিত, কিছুই সাব্যস্ত করতে পারেনি সে।

তারপর কি কোথায় সব ঘটেছিলো এখন আর তা মনে নেই খোকার। আমি কি সেখানে ছিলাম, খোকা জিগেশ করে নিজেকে, আমি কি স্বচক্ষে কোনো কিছু দেখেছি, হাবুডুবু খেতে থাকে খোকা এভাবে। ভোর না হতেই পলায়মান ভীত-সন্ত্রস্ত নরনারীর উপর অতর্কিতে পাশবিক উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মেশিনগান ও মর্টার সজ্জিত ক্ষিপ্র সৈন্যদল, এখনো মানুষজন এইসব বলাবলি করে। অচৈতন্যপ্রায় রঞ্জুকে গাছতলায় শতরঞ্চির উপরে ফেলে প্রাণঘাতী গুলিবৃষ্টির ভিতর হাজার হাজার নরনারীর মতো আমিও কি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছিলাম, ভেবে পায়না খোকা; যেন একটা দুঃস্বপ্ন। মন থেকে সবকিছু মুছে ফেলতে চায় খোকা। একলক্ষ চল্লিশ হাজার পায়ের তলায় প'ড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হ'য়ে গিয়েছিলো কি নিরঞ্জন রঞ্জু?

কিছুই জানে না খোকা। সে শুধু চেয়েছিলো রঞ্জু বেঁচে থাকুক। সে জানতো না এটা তার ভুল। একা বেঁচে থাকার অধিকার তার বিষণ্ণ দেশ কিছুতেই দিতে পারেনা রঞ্জুকে, খোকা পরে বুঝেছিলো।

দেশ তাহলে একটা পুকুর। অঞ্জু মঞ্জুর মতো এর নিস্তরঙ্গ নিথর তলদেশে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গিয়েছে রঞ্জু। এই নির্জন পুকুর পাড়ে একা একা সারাটা জীবন যে সে কি ক'রে কাটাবে খোকা তা ভেবে পায়না ঃ সে তো জানেই সহজে তার মৃত্যু নেই কেননা কোনো অসতর্ক মুহূর্তে যদি এমন কথা তার মনে উঁকি দেয়, তখনই রঞ্জু তাকে শাসন ক'রে বলে 'দাদা, আমি না তোর বুকে থুতু দিয়েছি!'

খুব বেশি নয় তাঁর রচনার পরিমাণ, কিন্তু মাহমুদুল হক যখনই লেখেন, লেখেন স্মরণীয়ভাবে, বারবার পড়তে হয় তাঁর প্রতিটি বই, অসামান্য ভাষাশিল্পী তিনি। কখনো রাজহাঁসের গতির সুষমা ছড়ানো তাঁর বাক্যবিন্যাসে, আবার কখনো কথা বুলিতে বেজে ওঠে চিলের তীক্ষ্ণ চিৎকার। জীবনের চোখে তিনি তাকান প্রেমিকের মতো, কিন্তু সেই দৃষ্টি মামুলি আবেগে বিহ্বল নয়; বুদ্ধিতে দীপ্র, গভীরতায় অতল। জীবনের উপরিস্তরেই তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর দৃষ্টি যায় আরো অনেক গভীরে—যেখানে আদিম লতাগুল্মে আচ্ছাদিত এক জটিল জগৎ, যা মানুষের অস্তিত্বকে নাড়া দেয় আমূল, আলো অন্ধকারে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দেয়।